Approved by the D. P. I. of Bengal, as a text-book for Classes V & VI of Secondary Schools.
Vide Calcutta Gazette, 7-7-38, 20-8-42 & 28-12-50)

সরল স্বাস্থ্য-বিধান

দ্বিতীয় ভাগ

[পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য]

সুলতানপুর (বীরভূম) শ্রীরাম উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের সহকারী
প্রধান শিক্ষক ও বাঙ্গালার ব্রতচারী সমিতির
চীফ্ ইন্স্ট্রাক্টর
শ্রীনবনীধর বন্দ্যোপাধ্যায়, বি-এ, বি-টি

ও

ডাক্তার **শ্রীদীনেশচন্দ্র চৌধুরী, এম্-বি**

প্রণীত

দি গ্লোব লাইব্রেরী
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
২নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এক টাকা চারি আনা মাত্র।

প্রকাশক—শ্রীপ্রফুল্লকুমার বসু
দি গ্লোব লাইব্রেরী
২নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ— ১৯৩৭
দ্বিতীয় সংস্করণ— ১৯৩৮
তৃতীয় সংস্করণ— ১৯৩৯
চতুর্থ সংস্করণ— ১৯৪০
পঞ্চম সংস্করণ— ১৯৪০
ষষ্ঠ সংস্করণ— ১৯৪২
সপ্তম সংস্করণ— ১৯৪৩
অষ্টম সংস্করণ— ১৯৪৪
নবম সংস্করণ— ১৯৪৪
দশম সংস্করণ— ১৯৪৪
একাদশ সংস্করণ— ১৯৪৫
দ্বাদশ সংস্করণ— ১৯৪৬
ত্রয়োদশ সংস্করণ— ১৯৪৭
চতুর্দশ সংস্করণ— ১৯৪৮
পঞ্চদশ সংস্করণ— ১৯৪৯
ষোড়শ সংস্করণ— ১৯৫১
সপ্তদশ সংস্করণ— ১৯৫৩

প্রিণ্টার—শ্রীইন্দ্রজিৎ পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
২৪৪, আপার সারকুলার রোড,
কলিকাতা—৬

4||

সূচীপত্র

প্রথম খণ্ড—পঞ্চম শ্রেণী

বিষয় পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায়

খাদ্যের আবশ্যকতা ১

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিভিন্ন জাতীয় খাদ্য ও তাহাদের উপকারিতা ... ৮

তৃতীয় অধ্যায়

কয়েকটি নিত্যব্যবহার্য খাদ্যের বিশেষ উপকারিতা ৩৩

চতুর্থ অধ্যায়

নিয়মিত ভোজনের আবশ্যকতা ... ৪৫

পঞ্চম অধ্যায়

অপরিমিত পানাহারের অপকারিতা ... ৫৪

ষষ্ঠ অধ্যায়

খাদ্যে ভেজাল ৫৯

সপ্তম অধ্যায়

কুখাদ্য ভোজনের অপকারিতা ... ৬৬

অষ্টম অধ্যায়

উপকারী ও অপকারী পানীয়··· ... ৭১

দ্বিতীয় খণ্ড—ষষ্ঠ শ্রেণী

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	
রোগের সংক্রমণ	৭৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	
স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন	১১০
তৃতীয় অধ্যায়	
যেখানে সেখানে থুথু ফেলার অনিষ্টকারিতা...	১১৯
চতুর্থ অধ্যায়	
ম্যালেরিয়া	১২৩
পঞ্চম অধ্যায়	
মশার কথা	
মশার জন্ম-বিবরণ	১২১
এনোফিলিস মশা চিনিবার উপায় ...	১৩৫
মশার জন্ম-নিবারণ	১৩৮

সরল স্বাস্থ্য-বিধান

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম খণ্ড—পঞ্চম শ্রেণী

প্রথম অধ্যায়

খাদ্যের আবশ্যকতা

খাদ্য—আমরা যে সমস্ত বস্তু আহার করিয়া জীবন ধারণ করি, তাহাদিগকে **খাদ্য** বলা হয়। ভাত, ডাইল, মাছ, মাংস, দুধ প্রভৃতি আমাদের খাদ্য। শিশুরা অনেক সময় মাটির টুকরা, ছোট ছোট ফলের আঁঠি, বোতাম প্রভৃতি গিলিয়া ফেলে। এগুলিকে খাদ্য বলা যায় যায় না ; কারণ এগুলি দ্বারা শরীরের ক্ষয়পূরণ, পোষণ বা বৃদ্ধিসাধনের কোন সহায়তা হয় না। ইহারা যেরূপ অবস্থায় পাকস্থলীতে প্রবেশ করে, ঠিক সেইরূপ অবস্থায় মলের সহিত নির্গত হইয়া যায়। ইহারা পরিপাকপ্রাপ্ত হয় না বলিয়া শরীরের যন্ত্রসমূহ ইহাদের সারাংশ গ্রহণ করিতে পারে না। দুর্ভিক্ষের সময় লোকে ঘাস, গাছের পাতা প্রভৃতি খাইয়া ক্ষুধা নিবারণ করে। এগুলিও খাদ্য নয় ; কারণ এগুলি দ্বারা শরীরের ক্ষয়পূরণ বা বৃদ্ধিসাধনের কোন সহায়তা হয় না। সুতরাং বুঝিতে পারিতেছ, যাহা কিছু খাওয়া যায় তাহাকেই খাদ্য বলা যায় না। **যে সমস্ত বস্তু পারপাক-**

প্রাপ্ত হইয়া শরীরের পোষণ, বৃদ্ধিসাধন ও ক্ষয়পূরণ করে এবং শরীরকে তাপ ও শক্তি প্রদান করে, সেই সমস্ত বস্তুকেই খাদ্য বলা হয়।

খাদ্যের প্রাপ্তিস্থান—আমরা কোথা হইতে আমাদের খাদ্যদ্রব্য পাই, তাহা জান কি? একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, **আমরা আমাদের সমস্ত খাদ্যদ্রব্য উদ্ভিদ্ ও প্রাণী হইতে পাইয়া থাকি।** চাউল, ডাইল, ময়দা, চিনি, গুড় প্রভৃতি মিষ্টদ্রব্য, তরকারি, ফল প্রভৃতি আমরা উদ্ভিদ্ হইতে পাই; মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ঘি প্রভৃতি আমরা প্রাণী হইতে পাইতে থাকি। সুতরাং আমাদের খাদ্যদ্রব্য প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা—(১) **উদ্ভিজ্জাত খাদ্য** ও (২) **প্রাণিজাত খাদ্য।**

ধান, গম, যব প্রভৃতি গাছের বীজ ভিন্ন আর কিছুই নহে। এগুলির মধ্যে খাদ্য সঞ্চিত থাকে বলিয়াই আমরা এগুলি হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকি। বীজের ন্যায় গাছের মূল, কাণ্ড, ফল, লতা, প্রভৃতির মধ্যেও খাদ্য সঞ্চিত থাকে। এজন্য উদ্ভিদ্‌ভোজী জীবগণ উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ হইতে খাদ্য গ্রহণ করে। সিংহ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি মাংসাশী প্রাণিগণ অন্যান্য জন্তুর মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করে। আমরা গরু, ছাগল, ভেড়া, হাঁস, মুরগী, মাছ প্রভৃতি প্রাণী হইতে দুধ, ঘি, মাংস, ডিম, মাছ প্রভৃতি খাদ্য প্রাপ্ত হই। এই সমস্ত জীবজন্তু আবার উদ্ভিদ্ ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উদ্ভিদ্‌ভোজী ও মাংসভোজী উভয় প্রকার প্রাণীকেই খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষ বা

পরোক্ষভাবে উদ্ভিদের উপর নির্ভর করিতে হয়। কাজেই **উদ্ভিদ্‌ই আমাদের খাদ্যের আধার।**

খাদ্যের শক্তি—বেশী ক্ষুধা পাইলে শরীর কিরূপ দুর্বল বোধ হয়, তাহা হয়ত তোমরা লক্ষ্য করিয়াছ। একদিন আহার না করিলে আমাদের শরীর ভীষণ দুর্বল হইয়া পড়ে। আবার আহার করিলেই শরীরে শক্তি পাওয়া যায়। ইহাতে বুঝা যায় যে, আমরা যে খাদ্য গ্রহণ করি উহাতে শক্তি নিহিত আছে। খাদ্যের এই শক্তি কোথা হইতে আসে?

তোমরা বোধ হয় জান, সূর্যের আলোক ব্যতীত গাছপালা বাঁচিতে পারে না। গাছ মাটি ও বায়ু হইতে যে খাদ্য সংগ্রহ করে, তাহা সূর্যের আলোক ও উত্তাপের সাহায্যে পরিপাক-প্রাপ্ত হয় এবং ইহার ফলে গাছের মূল, কাণ্ড, ফুল, ফল প্রভৃতি বিভিন্ন অংশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং প্রাণিগণ উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশ খাদ্যরূপে গ্রহণ করিয়া যে শক্তি লাভ করে, সূর্যকিরণের শক্তিই তাহার মূল। আমরা যে সমস্ত প্রাণী হইতে মাংস, ডিম দুধ, প্রভৃতি প্রাণিজাত খাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকি, তাহারাও উদ্ভিদ্‌ হইতে খাদ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। কাজেই দেখা যায়, **আমাদের খাদ্যে যে শক্তি নিহিত আছে তাহার মূল কারণ সূর্য।**

খাদ্যের আবশ্যকতা—জীবন ধারণের জন্য প্রাণীমাত্রেরই বায়ু ও জলের পরেই খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্য ভিন্ন কোন প্রাণীই দীর্ঘকাল জীবন ধারণ করিতে পারে না। নিম্নলিখিত চারিটি কার্যের জন্য আমাদের খাদ্য আবশ্যক :—

(১) **শরীরের ক্ষয়পুরণ।**
(২) **শরীরের গঠন ও বৃদ্ধিসাধন।**
(৩) **শরীরের তাপ উৎপাদন।**
(৪) **শরীরের শক্তি উৎপাদন।**

খাদ্য কিরূপে এই চারিটি কার্য সম্পাদন করিয়া আমাদের জীবন ধারণ বিষয়ে সহায়তা করে, তাহা এখানে বলা হইবে।

(১) **শরীরের ক্ষয়পূরণ**—প্রতি মুহূর্তেই আমাদের শরীরের ক্ষয় হইতেছে। আমরা উঠা-বসা, চলা-ফেরা প্রভৃতি যে কোন কাজই করি না কেন, তাহাতে আমাদের শরীরের ক্ষয় হয়। কোনরূপ পরিশ্রম না করিলেও আমাদের শরীরের ক্ষয় হয়; কারণ আমরা যখন বিশ্রাম করি বা নিদ্রা যাই, তখনও আমাদের ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতি শরীরের যন্ত্রাদির কাজ চলিতে থাকে এবং তাহাতেও শরীরের ক্ষয় হয়।

শরীরের এই ক্ষয় পূরণের জন্যই খাদ্য আবশ্যক। আমাদের শরীর রক্ত, মাংস প্রভৃতি উপাদান দ্বারা গঠিত। শরীরের নানা প্রকার কার্যের ফলে এই সমস্ত উপাদানেরই ক্ষয় হয়।

আমরা যে খাদ্য আহার করি, তাহা হইতে রক্ত, মাংস প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া এই ক্ষয় পুরণ করে।

(২) **শরীরের গঠন ও বৃদ্ধিসাধন**—জন্মের সময় শিশুর শরীরের দৈর্ঘ্য মাত্র এক হাত এবং ওজন মাত্র ৪।৫ সের থাকে। এই ক্ষুদ্র শিশুই ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ২৫।৩০ বৎসর বয়সে পূর্ণ মানবে পরিণত হয়। তখন তাহার শরীরের দৈর্ঘ্য সাড়ে তিন হাত এবং ওজন প্রায় দেড় মণ হয়। খাদ্যের

সাহায্যেই শিশুর শরীর এইরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শরীরবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর শরীরের গঠনকার্যও চলিতে থাকে। জন্মের সময় শরীরের তুলনায় শিশুর মস্তক বড় এবং হাত ও পা ছোট থাকে। উপযুক্ত খাদ্য পাইলেই শরীর ও হাত-পাগুলি মস্তকের তুলনায় বাড়িয়া উঠে। উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য না পাইলে শিশুর দেহ রীতিমত বাড়িতে পারে না এবং তাহার শরীর দিন দিন কৃশ ও দুর্বল হইয়া পড়ে। সুতরাং বুঝিতে পারিলে, শরীরের ক্ষয়পূরণ ব্যতীত **খাদ্যের দ্বারা শরীরের গঠন ও বৃদ্ধিসাধন হইয়া থাকে।**

(৩) **শরীরের তাপ উৎপাদন**—সমস্ত প্রাণীর দেহেই তাপ আছে। যতদিন পর্যন্ত দেহে প্রাণ থাকে, ততদিন এই তাপ থাকিবেই। মৃত প্রাণীর দেহে তাপ থাকে না। সুতরাং শরীরের তাপ জীবিত অবস্থার একটি প্রধান লক্ষণ। সুস্থ অবস্থায় মানুষের শরীরে ৯৮'৪ ডিগ্রী তাপ থাকে ; শরীর অসুস্থ হইলে এই তাপের হ্রাসবৃদ্ধি হইয়া থাকে। তোমরা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছ, চিকিৎসকেরা থার্মমিটার বা তাপমান যন্ত্রের সাহায্যে রোগীর শরীরের তাপের পরিমাণ নির্ণয় করিয়া থাকেন। প্রাণিদেহের এই স্বাভাবিক তাপ কোথা হইতে আসে ?

তোমরা সকলেই জান, কাঠ বা কয়লা পোড়াইলে তাহা হইতে তাপ উৎপন্ন হয়। বায়ুতে **অম্লজান** (অক্সিজেন) নামক একটি গ্যাস আছে। উহার সাহায্যেই দহনকার্য চলে। অম্লজান না পাইলে আগুন জ্বলিতে পারে না। একটি জ্বলন্ত মোমবাতি একটি কাচের গ্লাসের ভিতরে রাখিয়া একখানি পুরু কাগজ দিয়া

গ্লাসের মুখ চাপা দিলে দেখিবে, অল্পক্ষণ পরেই বাতিটি নিবিয়া যাইবে। গ্লাসের ভিতরের বায়ুতে যে পরিমাণ অম্লজান থাকে, তাহা দহনকার্যের ফলে ফুরাইয়া যাওয়াতেই বাতিটি নিবিয়া যায়। সুতরাং বুঝিতে পারিলে, **অম্লজান দহনকার্যের একটি প্রধান সহায়।**

আমাদের শরীরের ভিতরে সর্বদাই দহনকার্য চলিতেছে। এই দহনকার্য এত ধীরে ধীরে চলে যে, উহা হইতে কেবল তাপ উৎপন্ন হয়, আলোক উৎপন্ন হয় না। শরীরের ভিতরে **দহনকার্যেরও** প্রধান সহায় **অম্লজান**। আমরা শ্বাসক্রিয়া দ্বারা যে বায়ু গ্রহণ করি, তাহাতে **অম্লজান** থাকে। এই **অম্লজান** শরীরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দহনকার্য চালায়। কাঠ, কয়লা প্রভৃতি যেমন **অম্লজানের** সাহায্যে দগ্ধ হইয়া তাপ উৎপাদন করে, সেইরূপ **খাদ্যও আমাদের শরীরের ভিতরে অম্লজানের সাহায্যে মৃদুভাবে দগ্ধ হইয়া তাপ উৎপাদন করে।** আমরা যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য আহার করি, তাহা পরিপাকপ্রাপ্ত হইলে খাদ্যরসে পরিণত হইয়া রক্তের সহিত মিশিয়া যায়। এই খাদ্যরস **অম্লজানের** সাহায্যে দগ্ধ হইয়া শরীরের ভিতরে অনবরত তাপ উৎপন্ন করিতেছে।

(৪) **শরীরের শক্তি উৎপাদন**—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, খাদ্যের দ্বারাই শরীরের শক্তি উৎপন্ন হয়। খাদ্যের দ্বারা কিরূপে শক্তি উৎপন্ন হয়, তাহাই এখন তোমাদিগকে বলিব।

তোমরা সকলেই রেলগাড়ীর ইঞ্জিন দেখিয়াছ। ইঞ্জিনের ভিতরে কয়লা পোড়ান হয়। এই কয়লা পুড়িয়া যে তাপ উৎপন্ন

হয়, তাহাই ইহাকে চলিবার শক্তি প্রদান করে। যতক্ষণ কয়লা জ্বলিতে থাকে, ততক্ষণ তাপও থাকে, ইঞ্জিনও চলে। কয়লা ফুরাইয়া গেলে পুনরায় কয়লা দিতে হয়, নতুবা কয়লা নিবিয়া যাওয়ার ফলে তাপও থাকে না, ইঞ্জিনও চলিতে পারে না।

আমাদের শরীরও ইঞ্জিনের ন্যায় যন্ত্র বিশেষ। আমরা যে খাদ্যদ্রব্য আহার করি, তাহা শরীরের ভিতরে দগ্ধ হইয়া তাপ উৎপাদন করে। **এই তাপই আমাদিগকে কার্য করিবার শক্তি প্রদান করে।** ইঞ্জিনের তাপ ও শক্তি বজায় রাখিতে হইলে যেমন মধ্যে মধ্যে উহাতে কয়লা দিতে হয়, তেমনি আমাদের শরীরের তাপ ও শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আমাদিগের প্রত্যহ কয়েকবার আহার করিতে হয়।

উপরে খাদ্য সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইয়াছে তাহা হইতে বুঝা যায় :—

(১) **খাদ্য শরীরের ক্ষয়পূরণ করে।**

(২) **খাদ্য শরীরের গঠন ও বৃদ্ধিসাধন করে।**

(৩) **খাদ্য শরীরের তাপ উৎপাদন করে।**

(৪) **খাদ্য শরীরের শক্তি উৎপাদন করে।**

অনুশীলনী

১। খাদ্য কাহাকে বলে? যাহা কিছু খাওয়া যায়, তাহাকেই খাদ্য বলা যায় না কেন?

২। খাদ্যের শক্তি কোথা হইতে আসে?

৩। খাদ্যের আবশ্যকতা কি?

৪। আমাদের দেহে কিরূপে তাপের উৎপত্তি হয় বুঝাইয়া দাও।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিভিন্ন জাতীয় খাদ্য ও তাহাদের উপকারিতা

আমরা যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য আহার করি, তাহাদের সবগুলি একই জাতীয় নহে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার খাদ্যের ভিন্ন ভিন্ন গুণ। এজন্য শরীরের উপর ইহাদের ক্রিয়াও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। শরীরের উপর ভাতের ক্রিয়া একরূপ, রুটির ক্রিয়া অন্যরূপ, ফলের ক্রিয়া আবার ভিন্নরূপ।

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার খাদ্য শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশের গঠন ও পোষণ বিষয়ে সাহায্য করে। কোন জাতীয় খাদ্য মাংসপেশীর ক্ষয় পূরণ করে, কোন জাতীয় খাদ্য নার্ভতন্ত্রের উন্নতি সাধন করে, আবার কোন কোন খাদ্য অস্থির দৃঢ়তা সম্পাদন করে।

খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান—আমরা শরীররক্ষার জন্য যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য আহার করিয়া থাকি, তাহাতে নিম্নলিখিত ছয়টি উপাদান উপযুক্ত পরিমাণে থাকা আবশ্যক :—

(১) **আমিষজাতীয় উপাদান** (Protein)
(২) **শর্করাজাতীয় উপাদান** (Carbo-hydrate)
(৩) **তৈলজাতীয় উপাদান** (Fat)
(৪) **লবণজাতীয় উপাদান** (Salt)
(৫) **জল** (Water)
(৬) **খাদ্যপ্রাণ** (Vitamin)

সাধারণতঃ একই খাদ্যে ছয় প্রকার উপাদান থাকে না। কোন খাদ্যে একটি, কোন খাদ্যে বা ২।৩টি উপাদান থাকে। একমাত্র দুগ্ধে ছয় প্রকার উপাদানই উপযুক্ত পরিমাণে বিদ্যমান

আছে। এজন্য কেবল দুগ্ধ দ্বারাই কিছুকাল পর্যন্ত শিশুর শরীরের পোষণ ও বর্ধনের কার্য চলিতে পারে।



মানবদেহে মাংসপেশী



মানবদেহে নার্ভতন্ত্র

যে খাদ্যে যে জাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে থাকে, তাহাকে সেই জাতীয় খাদ্য বলা হয়। উপাদানের আধিক্য

অনুসারে আমাদের খাদ্যদ্রব্যের ছয়টি শ্রেণীর বিস্তৃত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল :—

(১) **আমিষজাতীয় খাদ্য**—যে সমস্ত খাদ্যে আমিষ বা মাংসজাতীয় উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে থাকে, তাহাদিগকে **আমিষজাতীয় খাদ্য** বলে। মাছ, মাংস, ডিম, ছানা প্রভৃতি এই জাতীয় খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত। চাউল, ডাইল, আটা, ময়দা, সুজি প্রভৃতি শর্করাজাতীয় খাদ্যের মধ্যে এবং বাদাম, পেস্তা, আখরোট প্রভৃতি তৈলপ্রধান ফলের মধ্যেও আমিষজাতীয় উপাদান অল্লাধিক পরিমাণে বিদ্যমান থাকে। প্রাণিজাত খাদ্যের মধ্যেই আমিষজাতীয় উপাদান বেশি থাকে।

(২) **শর্করাজাতীয় খাদ্য**—চাউল, চিঁড়া, খই, ডাইল, আটা, ময়দা, সুজি, ভুট্টা, যব, আলু, মানকচু, কাঁচকলা প্রভৃতি তরকারিতে **শ্বেতসার** নামক উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে আছে বলিয়া ইহাদিগকে **শ্বেতসারজাতীয় খাদ্য** বলে। চিনি, গুড়, মিছরি ও নানাবিধ ফলে শর্করা বা চিনিজাতীয় উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে আছে বলিয়া ইহাদিগকে শর্করাজাতীয় খাদ্য বলে। শ্বেতসারজাতীয় খাদ্য মুখের লালার সহিত মিশ্রিত হইলে শর্করা বা চিনিতে পরিণত হয় বলিয়া, এই উভয় প্রকার খাদ্যকে **শর্করাজাতীয় খাদ্য** বলা যাইতে পারে।

(৩) **তৈলজাতীয় খাদ্য**—ঘি, মাখন, চর্বি ও নানা প্রকার উদ্ভিজ্জ তৈল এবং নারিকেল, বাদাম, পেস্তা, আখরোট প্রভৃতি তৈলপ্রধান ফল এই জাতীয় খাদ্যের অন্তর্গত। ছানা,

মাছ, মাংস প্রভৃতি আমিষজাতীয় খাদ্যের মধ্যেও তৈলজাতীয় উপাদান অল্লাধিক পরিমাণে থাকে।

(৪) **লবণজাতীয় খাদ্য**—আমরা ভাত-তরকারির সহিত যে লবণ ব্যবহার করি, তাহা ছাড়া প্রায় সকল প্রকার খাদ্যেই অল্লাধিক পরিমাণে লবণ আছে। নানাবিধ ফল ও শাক-সবজির মধ্যেও অল্লাধিক লবণ স্বাভাবিকভাবে আছে। তাহা ছাড়া চাউল, ডাইল, যব, গম, দুধ, মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতির মধ্যেও অল্লাধিক পরিমাণে লবণজাতীয় উপাদান আছে।

(৫) **জল**—শরীররক্ষার জন্য বায়ুর পরেই জলের আবশ্যকতা। যে সমস্ত উপাদান দ্বারা আমাদের শরীর গঠিত, তাহার শতকরা প্রায় ৬৪ ভাগ জল। মল, মূত্র, ঘর্ম প্রভৃতির সহিত আমাদের শরীর হইতে প্রত্যহ প্রায় তিন সের জল বাহির হইয়া যায়। আমরা জল পান করিয়া উহার স্থান পূরণ করি।



দুধে জলের ভাগ

তাহা ছাড়া আমাদের প্রায় সকল প্রকার খাদ্যেই অল্লাধিক পরিমাণে জল আছে। সুতরাং কঠিন খাদ্যদ্রব্য দ্বারাও শরীরের জলের অভাব কতক পরিমাণে পূরণ হয়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, দুধে শতকরা ৮৭ ভাগ, মাছে প্রায় ৭৮ ভাগ, গোল আলুতে প্রায় ৭৬ ভাগ এবং চাউলে প্রায় ১৩ ভাগ জল আছে।



গোল আলুতে জলের ভাগ

(৬) **খাদ্যপ্রাণ**—আমাদের খাদ্যে উল্লিখিত পাঁচ প্রকার উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে থাকিলেও উহা দ্বারা আমাদের দেহের রীতিমত পোষণ ও বর্ধন হয় না। আমাদের খাদ্যের মধ্যে পাঁচটি উপাদান ব্যতীত আর একটি উপাদান থাকা একান্ত আবশ্যক। ইহাকে **খাদ্যপ্রাণ** বা **ভিটামিন** বলে। ভিটামিন জীবনীশক্তি অক্ষুন্ন রাখিবার পক্ষে একটি অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। খাদ্যে ইহার অভাব হইলে শিশুদের শরীর ভালরূপে পুষ্ট হয় না এবং যুবক ও পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিগণ নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হয়। ঢেঁকিছাটা চাউল, ডাইল, টাটকা তরকারি, ফলমূল, দুধ, মাখন, মাংস, ডিম প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্যে ইহা অল্পাধিক পরিমাণে থাকে। কিন্তু রন্ধন করিলে অগ্নির উত্তাপে ভিটামিন অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। উদ্ভিদের দেহের বিভিন্ন অংশেই ভিটামিন প্রস্তুত হয়। এজন্য টাটকা ফলমূল ও তরকারিতেই প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন পাওয়া যায়। প্রাণিগণ উদ্ভিদ্ হইতে ভিটামিন সংগ্রহ করে বলিয়া দুধ, মাখন, মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি প্রাণিজাত খাদ্য হইতেও এই উপাদান পাওয়া যায়।

খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের উপকারিতা

আমিষজাতীয় উপাদান—আমিষজাতীয় উপাদান মাংসপেশী ও অন্যান্য শারীরিক যন্ত্রাদির ক্ষয়পূরণ ও পুষ্টিসাধন করে। এজন্য ইহাকে পেশীগঠনকারী উপাদান বলে। এই জাতীয় খাদ্য শরীরের মধ্যে দগ্ধ হইয়া কিঞ্চিৎ তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে। তাহা ছাড়া আমিষজাতীয় উপাদান

ও লবণজাতীয় উপাদান জলের সহযোগে শরীরের মধ্যে রক্ত, রস প্রভৃতি প্রস্তুত করে। এই সমস্ত কারণে খাদ্যের সমস্ত উপাদানের মধ্যে আমিষজাতীয় উপদানই প্রধান। কেবলমাত্র আমিষজাতীয় খাদ্য আহার করিয়া মানুষ বাঁচিয়া থাকিতে পারে। সুতরাং জীবনরক্ষার জন্য এই জাতীয় উপাদানের প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা বেশি।

খাদ্যের মধ্যে আমিষজাতীয় উপাদানের পরিমাণ কম হইলে শরীর রীতিমত পুষ্টিলাভ করিতে পারে না। মাংসপেশীগুলি দুর্বল হইয়া পড়ে, কাজ করিবার উৎসাহ ও ক্ষমতা নষ্ট হয় এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ করিবার শক্তি কমিয়া যায়। **সুতরাং আমাদের খাদ্যের মধ্যে আমিষজাতীয় উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে থাকা নিতান্ত আবশ্যক।**

পূর্বেই বলা হইয়াছে, চাউল, ডাইল, ময়দা প্রভৃতি কোন কোন শর্করাজাতীয় খাদ্যের মধ্যে এবং ঘি, মাখন প্রভৃতি কোন কোন তৈলজাতীয় খাদ্যের মধ্যে অল্পাধিক পরিমাণে আমিষ-জাতীয় উপাদান থাকে। কিন্তু এই সমস্ত খাদ্যে আমিষজাতীয় উপাদানের পরিমাণ এত অল্প যে, উহা দ্বারা আমাদের শরীরের গঠন ও ক্ষয়পূরণের কার্য সম্পূর্ণরূপে চলিতে পারে না। সুতরাং ভাত, ডাইল, তরকারি প্রভৃতির সহিত উপযুক্ত পরিমাণে মাছ, মাংস, দুধ, দই, ডিম প্রভৃতি আহার করা একান্ত আবশ্যক। যাঁহারা মাছ-মাংস খান না, তাঁহাদের উপযুক্ত পরিমাণে দই, দুধ, ছানা প্রভৃতি ভোজন করিয়া আমিষজাতীয় উপাদানের অভাব পূরণ করা উচিত।

আমরা সচরাচর যে সমস্ত খাদ্য আহার করি, তন্মধ্যে মাছ ও দুধেই আমিষজাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে আছে। কিন্তু আজকাল আমাদের বাংলা দেশে মাছ ও দুধের অভাব হওয়ায় আমরা দিন দিন দুর্বল ও স্বাস্থ্যহীন হইয়া পড়িতেছি।



আমিষজাতীয় খাদ্য—মাছ, মাংস, দুধ, দই, ডিম, সন্দেশ, ডাইল

শর্করাজাতীয় উপাদান—শরীরে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করা শর্করাজাতীয় উপাদানের প্রধান কার্য। ইহা দ্বারা মাংসপেশী ও শারীরিক যন্ত্রাদির গঠন ও ক্ষয়পূরণ হয় না। অনেকের ধারণা যে, মাছ, মাংস প্রভৃতি আমিষজাতীয় খাদ্য না খাইলে শরীরে শক্তি হয় না, কিন্তু ইহা নিতান্ত ভুল। আমিষজাতীয় খাদ্যের দ্বারা মাংসপেশী ও অন্যান্য যন্ত্রাদি সুদৃঢ় ও সুগঠিত হয়, কিন্তু **আমরা তৈল ও শর্করাজাতীয় খাদ্য হইতেই তাপ ও কার্য করিবার শক্তি পাইয়া থাকি।** শর্করাজাতীয় খাদ্য শরীরের ভিতরে সহজে দগ্ধ হয় বলিয়া ইহা তাপ ও শক্তি উৎপাদনের পক্ষে অধিক উপযোগী। বেশী শারীরিক পরিশ্রম করিতে হইলে বেশী শক্তির প্রয়োজন। এজন্য যাহাদের বেশী

শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাদের এই জাতীয় খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে আহার করা উচিত।

শর্করাজাতীয় উপাদান হইতে শরীরের মেদ জন্মে। এজন্য যাহারা বেশী ভাত, রুটি বা মিষ্টদ্রব্য ভক্ষণ করে, তাহাদের শরীর মোটা ও কাজের অযোগ্য হইয়া পড়ে। যাহারা অল্প



শর্করাজাতীয় খাদ্য—চাউল, খৈ, ডাইল, আটা, ময়দা, চিনি, মিছরি, মধু, কাঁচকলা, মানকচু, ভুট্টা

পরিশ্রম করে কিংবা যাহাদের শরীরে মেদ বেশি, তাহাদের শর্করাজাতীয় খাদ্য অল্প পরিমাণে আহার করা উচিত।

তৈলজাতীয় উপাদান—শর্করাজাতীয় উপাদানের ন্যায় তৈলজাতীয় উপাদানও শরীরে তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে। শর্করাজাতীয় উপাদান অপেক্ষা তৈলজাতীয় উপাদানের তাপ উৎপাদন করিবার ক্ষমতা অনেক বেশি। কিন্তু শর্করাজাতীয় খাদ্য শরীরের ভিতরে সহজে দগ্ধ হয় বলিয়া, আমরা প্রকৃতপক্ষে ইহা হইতেই তাপ ও কার্যকরী শক্তি বেশি পাইয়া থাকি। তৈল

ও শর্করাজাতীয় উপাদানের ক্রিয়া প্রায় একরূপ হইলেও শরীর রক্ষার জন্য উভয় জাতীয় খাদ্যেরই প্রয়োজন।

তৈলজাতীয় খাদ্য অন্যান্য খাদ্যের পরিপাকে বিশেষ সাহায্য করে। আবার শর্করাজাতীয় উপাদান তৈল-জাতীয় খাদ্যের পরিপাকে বিশেষ সহায়তা করে।



তৈলজাতীয় খাদ্য—মাখন, ঘৃত, তৈল, নারিকেল, বাদাম, পেস্তা, আখরোট

ঘৃত অত্যন্ত গুরুপাক জিনিষ। কিন্তু ঘৃতের সহিত চিনি মিশাইয়া খাইলে উহা সহজে হজম হয়। এজন্য আমরা লুচির সঙ্গে চিনি খাইয়া থাকি।

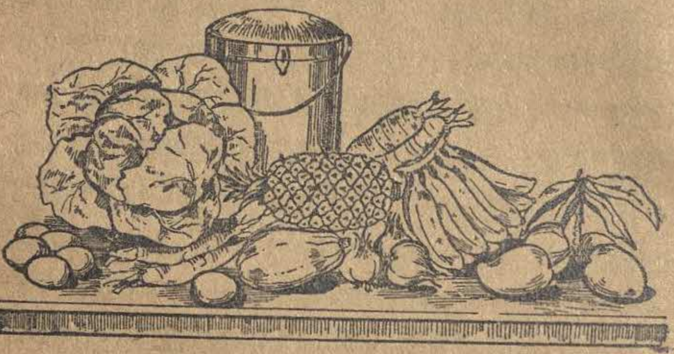
তৈলজাতীয় উপাদানে শরীরে তাপ উৎপাদনের ক্ষমতা বেশি বলিয়া শীতপ্রধান দেশের লোকেরা শরীরের উষ্ণতা-রক্ষার জন্য এই জাতীয় খাদ্য বেশী পরিমাণে আহার করিয়া থাকে। আমাদেরও শীতকালে তৈল ও শর্করাজাতীয় খাদ্য বেশী পরিমাণে

আহার করা উচিত। যাহারা বেশী শারীরিক পরিশ্রম করে, তাহাদের পক্ষে তৈলজাতীয় খাদ্য বিশেষ উপযোগী। কিন্তু এই জাতীয় খাদ্য অধিক পরিমাণে আহার করিয়া তদনুযায়ী পরিশ্রম না করিলে ইহার কতকাংশ মাংসপেশীর উপরে জমিতে থাকে এবং ইহার ফলে শরীর মোটা ও কাজের অযোগ্য হইয়া পড়ে।

লবণজাতীয় উপাদান—আমাদের শরীররক্ষার জন্য লবণজাতীয় উপাদান একান্ত আবশ্যক। আমরা খাদ্যের সহিত যে সাধারণ লবণ ব্যবহার করি, তাহা ছাড়া আমাদের সকল প্রকার খাদ্যেই কোন না কোন জাতীয় লবণ আছে। আমরা খাদ্যের সহিত যে লবণ ব্যবহার করি, তাহাতে খাদ্যের স্বাদ বাড়ে এবং পরিপাককার্যের সহায়তার জন্য মুখ হইতে লালা ও পাকস্থলী হইতে আমাশয়-রস নিঃসৃত হয়। এই লালা ও আমাশয়-রসের সাহায্যে আমিষ ও শর্করাজাতীয় খাদ্যের পরিপাকের সহায়তা হয়।

লবণজাতীয় উপাদানের সাহায্যেই আমাদের শরীরের রক্ত তরল অবস্থায় থাকে। রক্তে লবণজাতীয় উপাদান কমিয়া গেলে রক্ত জমাট হইয়া যায়। শরীরের হাড়, রক্ত, রস প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্যও নানা প্রকার লবণের আবশ্যক হয়। চূণজাতীয় লবণ আমাদের হাড় গঠনের সাহায্য করে। আমরা ভাত, তরকারি, দুধ, ডিম প্রভৃতি হইতে এই জাতীয় লবণ পাইয়া থাকি। দুধের মধ্যেই ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকে। এইজন্য উপযুক্ত পরিমাণে দুধ খাইতে না পাইলে শিশুদের হাড় শক্ত ও মোটা হয় না।

আমরা চাউল, ডাইল, মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি হইতে যে লবণ পাই, তাহা আমাদের শরীরের রক্ত প্রস্তুত করে। টাটকা ফল-মূল ও শাক-সবজি হইতে আমরা যে লবণ প্রাপ্ত হই, তাহা আমাদের রক্ত পরিষ্কার করে। বেশি দিন টাটকা ফল-মূল বা শাক-সবজি না খাইলে রক্ত দূষিত হইয়া স্কার্ভি নামক কঠিন রোগ জন্মে। পূর্বে জাহাজের নাবিকদের মধ্যে এই রোগের খুব বেশী প্রকোপ ছিল। আজকাল প্রত্যেক সমুদ্রগামী



লবণজাতীয় খাদ্য—দুধ, আম, কলা, আনারস, পেঁপে
পেঁয়াজ, মূলা, ডিম, গাজর, বাঁধাকপি

জাহাজেই প্রচুর পরিমাণে লেবুর রস রাখা হয়। শাক-সবজির অভাব হইলে নাবিকদিগকে এই রস খাইতে দেওয়া হয়। টাটকা ফল ও তরকারি হইতে যে লবণ পাওয়া যায়, লেবুর রসে তাহা যথেষ্ট পরিমাণে থাকে।

জল—মল, মূত্র, ঘর্ম ও নিঃশ্বাসের সহিত আমাদের শরীর হইতে প্রত্যহ প্রায় তিন সের জল বাহির হইয়া যায়। যে সমস্ত

খাদ্যদ্রব্যে জলের ভাগ বেশি আছে, তাহা আহার করিয়া এবং পৃথক্‌ভাবে জলপান করিয়া আমরা এই অভাব পূরণ করি। জলের নিজের কোন কার্য নাই; কিন্তু **পরিপাক-ক্রিয়া, রক্ত-সঞ্চালন-ক্রিয়া প্রভৃতি কতকগুলি কার্যের জন্য জলের একান্ত প্রয়োজন।** জল খাদ্যকে কোমল ও তরল করিয়া পরিপাকের সহায়তা করে। জল রক্তকে তরল অবস্থায় রাখিয়া শরীরের সর্বত্র ইহার চলাচলের সাহায্য করে। তাহা ছাড়া আমাদের শরীরের নানাবিধ দূষিত পদার্থ জলের সাহায্যে তরল হইয়া মল, মূত্র, ঘর্ম প্রভৃতির আকারে শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়।

বাহিরের ময়লা পরিষ্কার করিবার জন্য জলের যেমন প্রয়োজন, শরীরের ভিতরের ময়লা পরিষ্কার করিবার জন্যও জলের সেইরূপ প্রয়োজন। প্রচুর পরিমাণে জল পান করিলেই শরীরের ভিতরের ময়লা মল, মূত্র বা ঘর্মের সহিত নির্গত হইয়া যাইতে পারে। এজন্য আমাদের প্রত্যহ অন্ততঃ তিন সের জল পান করা আবশ্যক। প্রয়োজনের চেয়ে কম জল পান করিলে অনেক সময় কোষ্ঠ পরিষ্কার হয় না এবং শরীরের ভিতরে দূষিত পদার্থ জমিয়া নানাবিধ রোগের সৃষ্টি হয়। গ্রীষ্মকালে শরীর হইতে প্রচুর জল ঘর্মরূপে নির্গত হইয়া যায় বলিয়া শীতকাল অপেক্ষা গ্রীষ্মকালে অধিক পরিমাণে জল পান করা আবশ্যক শরীরে জলের অভাব হইলে আমাদের পিপাসা হয়। পিপাসা হইলেই জলপান করা উচিত।

ভিটামিন—আমাদের জীবনীশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ভিটামিন একান্ত আবশ্যক। ভিটামিনের অভাবে শিশুদিগের

শরীর রীতিমত পুষ্ট হয় না। তাহা ছাড়া বেরিবেরি, স্কার্ভি প্রভৃতি কঠিন পীড়া জন্মে। সুতরাং স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে যে সমস্ত খাদ্যে ভিটামিন আছে, তাহা উপযুক্ত পরিমাণে আহার করা একান্ত আবশ্যক।

আমাদের অধিকাংশ খাদ্যদ্রব্যেই অল্পাধিক পরিমাণে ভিটামিন আছে। খাবার জিনিষ বেশীক্ষণ রন্ধন করিলে অনেক সময় অগ্নির উত্তাপে ভিটামিন নষ্ট হইয়া যায়। এজন্য প্রত্যহ কিছু কিছু খাবার জিনিষ না রাঁধিয়া কাঁচা খাওয়া উচিত। অঙ্কুরিত ছোলা ও মুগ, নানাপ্রকার ফল-মূল, মাখন প্রভৃতি খাবার জিনিষ না রাঁধিয়াই খাওয়া যায়। শুষ্ক শাক-সবজিতে ভিটামিন প্রায় থাকে না, টাটকা শাক-সবজি ব্যবহার করা উচিত। চাউলে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন থাকে; কিন্তু চাউল বেশী ছাঁটিলে উহার ভিটামিন নষ্ট হইয়া যায়। এজন্য কলে ছাঁটা সাদা চাউল ব্যবহার না করিয়া **ঢেকিছাঁটা চাউল** ব্যবহার করা ভাল।

বিশুদ্ধ মাখন ও ঘৃতে প্রচুর ভিটামিন থাকে, কিন্তু বাজারে প্রচলিত ভেজিটেব্‌ল ঘৃতে উহা নাই। গুড়, লাল চিনি ও মধুতে ভিটামিন আছে কিন্তু সাদা চিনিতে নাই। কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় শহরে বেরিবেরি রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী দেখা যায়। টাটকা ফল ও শাক-সবজির অভাব এবং কলের প্রস্তুত বেশী ছাঁটা চাউল ব্যবহারই ইহার কারণ। কয়েক বৎসর পূর্বে লোকে ভিটামিন সম্বন্ধে কিছুই জানিত না। কিন্তু আজকাল লোকে ভিটামিনের উপকারিতা বুঝিতে পারিতেছে। এইজন্যই

দেশের সর্বত্র ঢেঁকিছাঁটা চাউল, যাঁতাভাঙ্গা আটা ও লাল চিনি ব্যবহারের দিকে ঝোঁক বাড়িতেছে।

আমাদের বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্যের মধ্যে এ পর্যন্ত পাঁচ প্রকার ভিটমিন আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহাদের নাম—**ভিটামিন-ক, ভিটামিন-খ, ভিটামিন-গ, ভিটামিন-ঘ, ভিটামিন-ঙ।** প্রত্যেক প্রকার ভিটামিনের প্রাপ্তিস্থান ও উপকারিতা সম্বন্ধে নিম্নে বলা হইল :—



ভিটামিনযুক্ত খাদ্য—ডিম, দুধ, ঘি, গাজর, কমলালেবু, পেঁপে,
বিলতী বেগুন, বাঁধাকপি, পেঁয়াজ, পালংশাক,
আম, সরিষার তৈল, কড্‌লিভার অয়েল
লেবু, অঙ্কুরিত ছোলা

(১) **ভিটামিন-ক**—এই জাতীয় ভিটামিন শরীরের বৃদ্ধি ও পুষ্টিসাধন করে, সংক্রামক রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করে এবং দৃষ্টিহীনতা রাতকাণা নামক চক্ষুরোগ

নিবারণ করে। শিশুদের খাদ্যে ইহার অভাব হইলে তাহাদের শরীর রীতিমত বাড়িতে পারে না।

অগ্নির সামান্য উত্তাপে এই জাতীয় ভিটামিন নষ্ট হয় না। কিন্তু উত্তাপ লাগিবার সময় বায়ুর সংস্পর্শে ইহা নষ্ট হয়। এজন্য মুখ-ঢাকা পাত্রে সিদ্ধ করিলে ইহা নষ্ট হয় না।

পালংশাক, গাজর প্রভৃতি সবুজ তরিতরকারি, ডিমের কুসুম, দুধ, মাখন ঘি, পশু ও মাছের যকৃৎ এবং কড্‌লিভার তৈলে ইহা বেশী পরিমাণে থাকে।

(২) ভিটামিন-খ—এই জাতীয় ভিটামিন শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধিসাধন করে এবং নার্ভতন্ত্রের শক্তিবৃদ্ধি করে। ইহা দ্বারা পরিপাক-ক্রিয়ার সহায়তা হয়। খাদ্যে ইহার অভাব হইলে বেরিবেরি রোগ জন্মে। শিশুদিগের খাদ্যে ইহার অভাব হইলে তাহাদের দেহ রীতিমত বৃদ্ধি পায় না।

এই জাতীয় ভিটামিন জলে গলিয়া যায়। রন্ধন করিলে ইহা সহজে নষ্ট হয় না; কিন্তু খাদ্যদ্রব্য সিদ্ধ করিয়া জল ফেলিয়া দিলে ইহা জলের সঙ্গে বাহির হইয়া যায়। এইজন্য ভাতের ফেন ফেলিয়া দিলে এইজাতীয় ভিটামিন বাহির হইয়া যায়।

ঢেঁকিছাঁটা চাউল, যাঁতাভাঙ্গা আটা, ছোলা, মুগ, ডিম, পশুর যকৃৎ ও হৃৎপিণ্ড, কমলালেবু, বিলাতী বেগুন প্রভৃতির মধ্যে ইহা বেশী পরিমাণে থাকে।

(৩) ভিটামিন-গ—এই জাতীয় ভিটামিন দাঁত ও হাড়ের পুষ্টিসাধন করে। খাদ্যে ইহার অভাব হইলে স্কার্ভি নামক উৎকট রোগ জন্মে।

কমলালেবু, বিলাতী বেগুন, নানাজাতীয় লেবু, আম, পেঁপে প্রভৃতি ফল এবং গাজর, বাঁধাকপি, পেঁয়াজ ও পালংশাকের মধ্যে ইহা প্রচুর পরিমাণে থাকে। শুষ্ক ফল-মূল ও শাক-সবজিতে ইহা প্রায় থাকে না। বেশী উত্তাপ পাইলে ইহা নষ্ট হইয়া যায়। ইহা জলে গলিয়া যায় বলিয়া তরকারি সিদ্ধ করিয়া জল ফেলিয়া দিলে ইহার অধিকাংশ বাহির হইয় যায়।

(৪) **ভিটামিন-ঘ**—এই জাতীয় ভিটামিনের সাহায্যে শিশুদিগের অস্থি সুগঠিত ও দৃঢ় হয়। খাদ্যে ইহার অভাব হইলে শিশুদিগের 'রিকেট্‌স' বা কৃশাস্থি রোগ হয়। সূর্যের কিরণ গায়ে লাগিলে চর্মের নীচে এই জাতীয় ভিটামিন গঠিত হয়। সরিষার তৈল গায়ে মাখিয়া শিশুদিগকে কিছুক্ষণ রৌদ্রে রাখা খুব ভাল। ইহাতে তাহদের শরীরে এই জাতীয় ভিটামিন অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয় এবং ফলে উহাদের কৃশাস্থি রোগ জন্মিতে পারে না।

মাতৃদুগ্ধ, গোদুগ্ধ, ঘৃত, মাখন, ছানা, সরিষার তৈল, নারিকেল তৈল, কড্‌লিভার তৈল ও ডিমের কুসুমে ইহা বেশী পরিমাণে থাকে।

(৫) **ভিটামিন-ঙ**—এই জাতীয় ভিটামিন আমাদের শরীরের পক্ষে বিশেষ উপকারী। চাউল, যব, গম, আটা, দুধ, ডিম প্রভৃতির মধ্যে ইহা অল্পাধিক পরিমাণে থাকে।

ভিটামিনের তালিকা

আমাদের নিত্যব্যবহার্য খাদ্যদ্রব্যের কোন্‌টির মধ্যে কোন্ জাতীয় ভিটামিন কি পরিমাণে আছে, এখানে তাহার একটি

তালিকা দেওয়া হইল। ১, ২, ৩ প্রভৃতি সংখ্যা ভিটামিনের পরিমাণ বুঝায়। ১ সংখ্যা দ্বারা সামান্য পরিমাণে ভিটামিন আছে বুঝিতে হইবে। ২ সংখ্যা ১ অপেক্ষা বেশী পরিমাণে ভিটামিনের অস্তিত্ব বুঝায়, ৩ সংখ্যা ২ অপেক্ষা অধিক ভিটা-মিনের অস্তিত্ব বুঝায় ইত্যাদি। যেখানে শূন্য আছে সেই দ্রব্যে ভিটামিন নাই বুঝিতে হইবে। যেখানে শূন্য বা কোন সংখ্যা নাই, সেই দ্রব্যে ভিটামিন আছে কিনা তাহা এখনও জানা যায় নাই। এই তালিকায় কেবল প্রথম তিন জাতীয় ভিটামিনের পরিমাণ দেখান হইল। ঘ ও ঙ-ভিটামিন মাত্র অল্প কয়েকটি খাদ্যের মধ্যেই আবিষ্কৃত হইয়াছে।

খাদ্যদ্রব্য	ভিটামিন-ক	ভিটামিন-খ	ভিটামিন-গ
১। চাউল			
ঢেঁকিছাঁটা চাউল	১	২	—
কলে ছাঁটা চাউল	০	০	০
২। গম			
গম	১	২	—
যাঁতাভাঙ্গা আটা	১	২	—
সাদা ময়দা	০	১	—
৩। ডাইল			
ডাইল	১	২	—
অঙ্কুরিত ছোলা, মুগ ও মটর	১	২	২

খাদ্যদ্রব্য	ভিটামিন-ক	ভিটামিন-খ	ভিটামিন-গ
৪। মিষ্টদ্রব্য			
সাদা চিনি	০	০	০
গুড়	০	১	০
মধু	০	১	০
৫। ফল			
আম	১	—	২
কলা	১	১	১
লিচু	—	১	২
পেয়ারা	—	১	১
পেঁপে	১	১	২
আনারস	—	—	২
কমলালেবু	১	২	৩
পাতি ও কাগজি লেবু	—	১	১
বাদাম	১	২	—
আঙুর	—	২	২
কিস্‌মিস্‌	—	১	১
বেদানা	—	১	১
নারিকেল	১	২	০
তেঁতুল	—	১	১
বিলাতী বেগুন	১	৩	৩
৬। তরকারি			
আলু	১	২	২
বেগুন	—	১	১
পটোল	—	১	১

খাদ্যদ্রব্য	ভিটামিন-ক	ভিটামিন-খ	ভিটামিন-গ
মূলা	—	১	—
ঢেঁড়স	—	১	১
গাজর	২	২	২
শালগম	—	২	—
ফুলকপি	১	২	১
বাঁধাকপি	১	২	২
পালংশাক	৩	৩	৩
পেঁয়াজ	—	২	২
রসুন	—	—	২
৭। তৈল			
সরিষার তৈল	০	০	০
নারিকেল তৈল	০	০	০
তিলের তৈল	০	০	০
চীনাবাদামের তৈল	২	০	০
কড্‌লিভার অয়েল	৪	—	০
৮। দুগ্ধ			
কাঁচা দুধ	৩	২	১
বেশী জ্বাল দেওয়া দুধ	১	১	—
দধি ও ঘোল	১	৩	১
ঘৃত ও মাখন	৩	—	—
৯। মৎস্য			
মৎস্য	২	২	—
মাছের ডিম	১	২	—

খাদ্যদ্রব্য	ভিটামিন-ক	ভিটামিন-খ	ভিটামিন-গ
১০। মাংস			
কাঁচা মাংস	১	১	১
সিদ্ধ মাংস	১	১	১
পশুর মস্তিষ্ক	১	২	—
পশুর যকৃৎ	২	২	—
পাখীর ডিম	২	৩	০

মিশ্র খাদ্যের আবশ্যকতা

তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ যে, আমাদের খাদ্য সাধারণতঃ চারি প্রকার উপাদান দ্বারা শরীরের বৃদ্ধিসাধন, ক্ষয়পূরণ এবং তাপ ও শক্তি উৎপাদন করিতেছে—কিন্তু একই জাতীয় খাদ্যের দ্বারা এই চারিটি কার্য চলিতে পারে না। কাজেই আমাদের এমন খাদ্য গ্রহণ করা উচিত, যাহাতে উল্লিখিত চারি প্রকার গুণই আছে। একমাত্র দুগ্ধ ব্যতীত অপর কোন খাদ্যেই এই চারিটি গুণ একত্র বিদ্যমান নাই। দুগ্ধে খাদ্যের সকল প্রকার উপাদানই যথেষ্ট পরিমাণে আছে। এজন্য **দুগ্ধকে আদর্শ বা পূর্ণ খাদ্য বলা হয়।** পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির পক্ষে একমাত্র দুগ্ধের উপর নির্ভর করা সম্ভবপর নহে; কারণ কেবল দুগ্ধ পান করিয়া জীবনধারণ করিতে হইলে পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকে এত বেশী পরিমাণে দুগ্ধ পান করিতে হইবে যে, উহা হজম করা তাহার পক্ষে কঠিন হইবে। তাহা ছাড়া এত অধিক দুগ্ধ পাওয়াও কঠিন।

আমাদের শরীরের রক্ত, মাংস, হাড় প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে গঠিত। শরীরের যে অংশ যে

উপাদানে গঠিত, সেই অংশের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধনের জন্য খাদ্যদ্রব্যের সহিত সেই জাতীয় উপাদান উপযুক্ত পরিমাণে গ্রহণ করা আবশ্যক। এজন্য আমরা আমিষ, শর্করা, তৈল ও লবণজাতীয় খাদ্য একসঙ্গে মিশাইয়া আহার করিয়া থাকি। ইহাকেই **মিশ্রখাদ্য** বলে।

মিশ্রখাদ্যের গুণ অনেক। মিশ্রখাদ্য রুচিকর। ডাইল বা তরকারিতে লবণ না মিশাইলে উহা রুচিকর হয় না। শুধু লুচি যে রূপ রুচিকর, চিনি মিশাইলে উহা তাহা অপেক্ষা বেশী রুচিকর হয়। রুচিকর খাদ্য যত সহজে পরিপাক হয়, অন্য খাদ্য তত সহজে পরিপাক হয় না। রুচিকর খাদ্য মুখে দিলে মুখ হইতে প্রচুর লালা বাহির হয় এবং উহা খাদ্যের সঙ্গে মিশিয়া উহার পরিপাকের সহায়তা করে। তাহা ছাড়া এক জাতীয় খাদ্য অন্য জাতীয় খাদ্যের পরিপাকের বিশেষ সহায়তা করে। শুধু মাংস খাইলে উহা জীর্ণ হইতে যত সময় লাগে, মাংসের সহিত ভাত খাইলে তাহা পরিপাকপ্রাপ্ত হইতে তত সময় লাগে না। এইজন্যই মিশ্রখাদ্য আমাদের শরীররক্ষার পক্ষে যত উপযোগী, অন্য কোন এক জাতীয় খাদ্য তত উপযোগী নহে।

মিশ্রখাদ্যে বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ—আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, শরীররক্ষা করিতে হইলে আমাদের উপযুক্ত পরিমাণে মিশ্রখাদ্য গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। এই মিশ্রখাদ্যে কোন্ জাতীয় খাদ্য কি পরিমাণে থাকা আবশ্যক তাহা জানা দরকার। আমাদের খাদ্যে কোন্ জাতীয় উপাদান কি পরিমাণে থাকা আবশ্যক, তাহা অনেকটা স্থান, ঋতু ও

ব্যক্তির উপর নির্ভর করে। শরীরের তাপ রক্ষার জন্য শীতপ্রধান দেশের লোকের তৈলজাতীয় খাদ্য বেশী পরিমাণে আহার করা প্রয়োজন। শরীর গঠনের জন্য শিশু ও বালকদের আমিষ-জাতীয় খাদ্যের আবশ্যকতা বেশি। যাহাদের বেশী শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহাদের শর্করাজাতীয় খাদ্যের আবশ্যকতা অধিক। শরীরের উষ্ণতা রক্ষার জন্য গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা শীতকালে তৈলজাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন অধিক। কাজেই সকল লোকের জন্য খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের একটি নির্দিষ্ট তালিকা করা যায় না। একজন সাধারণ পরিশ্রমী বাঙালীর প্রত্যহ কোন্ জাতীয় উপাদান কি পরিমাণে আহার করা আবশ্যক, তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

(১) আমিষজাতীয় উপাদান	দুই ছটাক
(২) শর্করাজাতীয় উপাদান	আধ সের
(৩) তৈলজাতীয় উপাদান	দেড় ছটাক
(৪) লবণজাতীয় উপাদান	আধ ছটাক

অন্য প্রকারে বলিতে গেলে, বাঙালীর দৈনিক খাদ্যের তিন ভাগের দুই ভাগ শর্করাজাতীয়, ছয় ভাগের এক ভাগ আমিষ-জাতীয়, আট ভাগের এক ভাগ তৈলজাতীয় এবং চব্বিশ ভাগের একভাগ লবণজাতীয় খাদ্য হওয়া আবশ্যক। ইহা ছাড়া প্রত্যহ উপযুক্ত পরিমাণে ফল ও শাক-সবজি ভোজন করিয়া ভিটামিন গ্রহণ করা আবশ্যক। প্রায় সকল প্রকার খাদ্যেই অল্পাধিক পরিমাণে জল থাকে। এই জল ছাড়াও পৃথক্‌রূপে প্রত্যহ অন্ততঃ তিন সের জল পান করা উচিত। আমরা খাদ্য-

দ্রব্যের সহিত ফল ও শাক-সবজির খোসা, আঁশ প্রভৃতি অনেক অসার পদার্থ গ্রহণ করিয়া থাকি। এই অসার পদার্থগুলিরও আবশ্যকতা আছে। এগুলি মল বৃদ্ধি করে বলিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া শরীরের দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া যাইবার সুবিধা হয়।

স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ করিতে হইলে খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে সমতা রক্ষা করিয়া চলা উচিত।

খাদ্যের পরিমাণ—আমাদের দৈনিক কোন্ জাতীয় উপাদান কি পরিমাণে আহার করা দরকার, তাহা আমরা শিখিয়াছি। এখন ঐ সকল উপাদানের মাত্রা ঠিক রাখিতে হইলে কোন্ খাদ্য কি পরিমাণে আহার করা আবশ্যক, তাহা জানা দরকার। বাঙালী যুবকের পক্ষে দৈনিক কোন্ খাদ্য কি পরিমাণে আহার করা আবশ্যক, তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

চাউল	এক পোয়া	দধি ও দুগ্ধ	আধ সের
আটা	তিন ছটাক	তৈল	দেড় তোলা
ডাইল	দেড় ছটাক	ঘৃত	এক তোলা
মাছ-মাংস	তিন ছটাক	চিনি ও গুড়	আধ ছটাক
তরকারি	দেড় পোয়া	লবণ	আধ ছটাক

উপরের তালিকার কোন একটি খাদ্যের পরিমাণ কমাইলে ঐ জাতীয় অন্য খাদ্যের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে। আবার যদি কোন একটির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়, তাহা হইলে ঐ জাতীয় অপর খাদ্যের পরিমাণ কমাইতে হইবে। যেমন, মাছ-মাংস

না খাইলে অধিক পরিমাণে ডাইলের ব্যবহার করিতে হইবে। দুগ্ধের পরিমাণ কমাইলে ঘৃত ও তৈলের পরিমাণ বাড়াইতে হইবে। চাউল অপেক্ষা আটাতে আমিষজাতীয় উপাদান কিছু বেশি আছে বলিয়া এক বেলা ভাত ও একবেলা রুটি খাওয়া ভাল। যাহারা রুটি পছন্দ করে না, তাহারা দুই বেলাই ভাত খাইতে পারে। রুটি না খাইলে তিন ছটাক আটার পরিবর্তে অন্ততঃ এক পোয়া চাউল ব্যবহার করা উচিত। উপরের তালিকার নির্দিষ্ট খাদ্য ব্যতীত আমাদের প্রত্যহ কিছু টাট্কা ফল-মূল ভক্ষণ করিয়া ভিটামিন গ্রহণ করা উচিত। অঙ্কুরিত ছোলা ও মুগ এবং গুড়ে যথেষ্ট ভিটামিন থাকে; সুতরাং প্রত্যহ সকালে বিকালে গুড়ের সহিত কিছু অঙ্কুরিত ছোলা বা মুগ খাইলে আমরা অল্প খরচে যথেষ্ট ভিটামিন গ্রহণ করিতে পারি।

বিভিন্ন খাদ্যের পরিমাণ সম্বন্ধে কোন ধরা-বাঁধা নিয়ম করা যায় না। উপরে ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যের পরিমাণের যে তালিকা দেওয়া হইয়াছে তাহা একজন বলিষ্ঠ পরিশ্রমী বাঙালী যুবকের পক্ষে উপযোগী। সুতরাং উহা বালক-বৃদ্ধ সকলের পক্ষে উপযোগী হইতে পারে না। বয়স, অবস্থা ও জীবিকা ভেদে খাদ্যের পরিমাণ কম বেশি হইয়া থাকে। যে খাদ্যে বালকের শরীর রক্ষা হয়, তাহার দ্বারা যুবকের শরীররক্ষা হয় না। আবার যুবকের যে পরিমাণ খাদ্য আবশ্যক, বৃদ্ধের তাহা অপেক্ষা কম খাদ্যের প্রয়োজন। একজন শ্রমশীল ও একজন নিষ্কর্মা ব্যক্তির খাদ্যের পরিমাণ কখনও সমান হইতে পারে না। শরীরের ক্ষয়পূরণ আহারের একটি প্রধান উদ্দেশ্য।

সুতরাং যাহার শরীরের যত বেশি ক্ষয় হয় তাহার তত বেশি খাদ্য গ্রহণ করা আবশ্যক। খাদ্যের পরিমাণ কমই হউক আর বেশিই হউক, খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের সমতা রক্ষা করা একান্ত আবশ্যক।

অনুশীলনী

১। আমাদের খাদ্যে কি কি উপাদান থাকা আবশ্যক? উপাদানের আধিক্য হিসাবে আমাদের খাদ্যদ্রব্য কি কি প্রধান ভাগে বিভক্ত?

২। শর্করাজাতীয় খাদ্যের আবশ্যকতা কি? কয়েকটি শর্করাজাতীয় খাদ্যের নাম কর।

৩। আমিষজাতীয় ও তৈলজাতীয় উপাদানের কার্যের পার্থক্য কি? এমন কয়েকটি উদ্ভিজ্জ খাদ্যের নাম কর, যাহাতে আমিষজাতীয় উপাদান অল্লাধিক পরিমাণে আছে।

৪। আমাদের শরীররক্ষার জন্য জলের কি প্রয়োজন?

৫। ভিটামিন কয় প্রকার? কি কি খাদ্যে বিভিন্ন প্রকারের ভিটামিন আছে এবং তাহাদের উপকারিতা কি?

৬। মিশ্রখাদ্য বলিলে কি বুঝ? উহার আবশ্যকতা কি? আমরা দৈনিক যে মিশ্রখাদ্য গ্রহণ করি, তাহাতে কোন্ জাতীয় উপাদান কি পরিমাণে থাকা আবশ্যক?

৭। একটি ঘোড়া ও একটি সিংহের মধ্যে ২০ মাইল দৌড়ের প্রতিযোগিতা হইলে কে জিতিবে বলিয়া মনে কর? কেন?

তৃতীয় অধ্যায়

কয়েকটি নিত্যব্যবহার্য খাদ্যের বিশেষ উপকারিতা

দুগ্ধ—মানুষের যত প্রকার খাদ্য আছে, তাহার মধ্যে দুগ্ধ সর্বশ্রেষ্ঠ। শরীররক্ষার জন্য যে সকল উপাদান আবশ্যক, দুগ্ধে তাহার সমস্তগুলিই আছে। **এজন্য দুগ্ধকে আদর্শ বা পূর্ণখাদ্য** বলা হয়। দুই বৎসর বয়স পর্যন্ত শিশুদের পক্ষে ইহাই প্রধান খাদ্য। উপযুক্ত পরিমাণে দুগ্ধ পান করিতে না পারিলে শিশুদের শরীর পুষ্ট ও বর্ধিত হয় না। বালক, বৃদ্ধ ও যুবক সকলের পক্ষেই দুগ্ধ অতি উৎকৃষ্ট খাদ্য। আজীবন দুগ্ধ পান করিতে পারিলে স্বাস্থ্যবান্ ও দীর্ঘজীবি হওয়া যায়।

গো-দুগ্ধ—সকল প্রকার দুগ্ধের মধ্যে গো-দুগ্ধই অধিক প্রচলিত। ৪০।৫০ বৎসর পূর্বে পল্লীগ্রামে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতেই দুই-চারিটি গরু থাকিত এবং বাড়ীর সকলে প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ পান করিতে পাইত। কিন্তু আজকাল অনেক বাড়ীতে গরু দেখা যায় না। এই কারণে আমাদের দেশে দুগ্ধের এত অভাব হইয়াছে। দুগ্ধের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় অনেকে দুগ্ধ কিনিতে পারে না ; যাহাদের ক্রয় করিবার ক্ষমতা আছে, তাহারাও বিশুদ্ধ দুগ্ধ পায় না। দুগ্ধ ও মৎস্যই বাঙালীর প্রধান খাদ্য। দুগ্ধের অভাবেই আজকাল আমাদের স্বাস্থ্যের এত অবনতি ঘটিতেছে।

কাঁচা দুধ জ্বাল দেওয়া দুধের চেয়ে বেশী পুষ্টিকর এবং শীঘ্র পরিপাক হয়। কিন্তু কাঁচা দুধ পান করা সর্বদা নিরাপদ নহে। অনেক সময় কলেরা প্রভৃতি রোগের জীবাণু দুধের সহিত

মিশিয়া রোগের বিস্তারসাধন করে। দুধ জ্বাল দিলে অগ্নির উত্তাপে এই সমস্ত জীবাণু নষ্ট হইয়া যায়। দুধে প্রথম তিন প্রকার ভিটামিন যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। দুধ জ্বাল দিলে ইহার ভিটামিন কতক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। দুধ বেশী ঘন করিয়া জ্বাল দিলে উহা গুরুপাক হইয়া যায়। এজন্য বেশী জ্বাল দেওয়া দুধ অপেক্ষা এক 'বলক' জ্বালের দুধ বেশি উপকারী। কখনও ঠাণ্ডা দুধ খাওয়া উচিত নয়। যে দুধ পূর্বে জ্বাল দেওয়া হইয়াছে পান করিবার পূর্বে তাহাও একবার ফুটাইয়া লওয়া উচিত। ইহাতে অগ্নির উত্তাপে রোগের জীবাণু মরিয়া যায়। অনেক সময় গরুরও যক্ষ্মা, বসন্ত প্রভৃতি রোগ হইতে দেখা যায়। এই সমস্ত রোগের দ্বারা আক্রান্ত গরুর দুধ পান করা উচিত নহে।

মহিষ দুগ্ধ—মহিষের দুগ্ধে গরুর দুগ্ধের দ্বিগুণ মাখন থাকে। এজন্য মহিষ-দুগ্ধ গো-দুগ্ধ অপেক্ষা গুরুপাক। কিন্তু মহিষ-দুগ্ধে সমান পরিমাণ জল মিশাইয়া লইলে গো-দুগ্ধের ন্যায় ইহা সহজে পরিপাকপ্রাপ্ত হয়।

ছাগ-দুগ্ধ—ছাগ-দুগ্ধ প্রায় গো-দুগ্ধের সমান গুণসম্পন্ন। ইহা শিশু ও রোগীর পক্ষে খুব উপকারী। যে সমস্ত শিশুর যকৃৎ খারাপ, তাহাদের পক্ষে ছাগ-দুগ্ধ বিশেষ উপকারী।

দধি—অল্প গরম দুগ্ধে টক মিশাইয়া দধি প্রস্তুত করা হয়। যে দধি ভালরূপে জমে এবং যাহা কিঞ্চিৎ টক, তাহাই উৎকৃষ্ট। দুগ্ধ এক 'বলক' জ্বাল দিয়া দধি প্রস্তুত করিলে উহাতে প্রথম তিন প্রকার ভিটামিনই থাকে। দধি শরীরের অনেক অনিষ্টকর জীবাণু নষ্ট করে এজন্য কলেরার প্রাদুর্ভাব হইলে দধি, ঘোল

প্রভৃতি আহার করা ভাল। দধি খুব মুখরোচক বলিয়া ইহা পরিপাককার্যের বিশেষ সহায়তা করে। অতিরিক্ত টক হইলে দধি স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর হয়। বিজ্ঞ চিকিৎসকগণের মতে রীতিমত দধি ভোজন করিলে মানুষ দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে। কিন্তু রাত্রিতে দধি ভক্ষণ স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর।

ঘোল—দধি মন্থন করিয়া মাখন তুলিয়া লইলে যে তরল ভাগ থাকিয়া যায়, তাহাকে **ঘোল** বলে। ঘোলে দুগ্ধের তৈল-জাতীয় উপাদান সামান্য পরিমাণে থাকে। কিন্তু অন্য সমস্ত উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। দুগ্ধ ও দধি অপেক্ষা ঘোল লঘুপাক বলিয়া ইহা অনেক সময় রোগীদিগকে পথ্যরূপে দেওয়া হয়। ইহা একটি উপাদেয় ও তৃপ্তিকর খাদ্য এবং পানীয়।

ছানা—উষ্ণ দুগ্ধের সহিত লেবুর রস বা অন্য কোন প্রকার অম্লরস মিশাইয়া ছানা প্রস্তুত করা হয়। ইহা অতিশয় সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য। ইহাতে দুগ্ধের আমিষজাতীয় উপাদান প্রায় সমস্তই থাকে। উপযুক্ত পরিমাণে ছানা খাইতে পারিলে মাছ মাংস না খাইলেও চলে। মাছ-মাংসের আমিষ উপাদান অপেক্ষা ইহার আমিষ উপাদান নির্দোষ ও সহজে পরিপাকপ্রাপ্ত হয়। যাঁহারা মাছ-মাংস খান না, তাঁহাদের পক্ষে ছানা একান্ত আবশ্যক। ছানা হইতে সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতি যে সমস্ত মিষ্টদ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহাও পুষ্টিকর খাদ্য।

মাখন—দুগ্ধ ও দধি মন্থন করিলে মাখন উৎপন্ন হয়। তৈল-জাতীয় খাদ্যের মধ্যে মাখন অতি উৎকৃষ্ট। টাটকা মাখন সুস্বাদু, বলকারক ও পুষ্টিকর খাদ্য। ইহা ঘৃত অপেক্ষা সহজপাচ্য।

ঘৃত—মাখন জ্বাল দিলে ঘৃত প্রস্তুত হয়। তৈলজাতীয় খাদ্যের মধ্যে ঘৃতই প্রধান। ইহা মাখনের মত গুণশালী কিন্তু মাখন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ গুরুপাক। ঘৃতে ভিটামিন-ক যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। ঘৃত শরীরের পক্ষে এত উপকারী বলিয়াই লোকে কথায় বলে—'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ' অর্থাৎ ঋণ করিয়াও ঘৃত ভক্ষণ করিবে।

আমরা সাধারণতঃ দুই প্রকার ঘৃত ব্যবহার করি—গব্য ঘৃত ও ভয়সা ঘৃত। ভয়সা ঘৃত গব্য ঘৃতের ন্যায় গুণশালী নয় এবং গব্য ঘৃত অপেক্ষা গুরুপাক।

মৎস্য—আমিষজাতীয় মধ্যে খাদ্যের মৎস্য বাঙালীর একটি প্রিয় খাদ্য। লোকে কথায় বলে—'মাছে ভাতে বাঙালী'। পূর্বে বাঙ্‌লা দেশে প্রচুর মৎস্য পাওয়া যাইত বলিয়া তখন বাঙালীর খাদ্যে আমিষ উপাদানের অভাব ছিল না। এজন্য তখন বাঙালী জাতির স্বাস্থ্য বর্তমান কালের চেয়ে অনেক উন্নত ছিল।

মৎস্য সুপাচ্য, সুস্বাদু ও বলকারক খাদ্য। মাংস বাঙালীর নিত্যব্যবহার্য খাদ্য নহে। মৎস্যের দ্বারাই আমাদের খাদ্যে উহার স্থান পূরণ হইয়া থাকে। মাংস অপেক্ষা মৎস্যে তৈলের ভাগ কম; এজন্য ইহা সহজেই হজম হয়। কই, মাগুর, সিঙ্গি প্রভৃতি মৎস্যে তৈলের ভাগ খুব কম বলিয়া সহজে পরিপাক হয়। এজন্য এই সব মৎস্য রোগীর পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

মৎস্যের মধ্যে রোহিত সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহাতে আমিষ ও তৈল-জাতীয় উপাদান প্রায় মাংসের সমান। ইলিস মাছে তৈলের ভাগ বেশি বলিয়া ইহা অপেক্ষাকৃত দুষ্পাচ্য।

মৎস্যের ডিম্ব পুষ্টিকর ও বলকারক। মৎস্যের তৈল ও ডিম্বে যথেষ্ট ভিটামিন আছে।

মৎস্য টাটকা অবস্থায় খাওয়া উচিত। পচা মাছ দুষ্পাচ্য ও স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী। লোণা ও শুষ্ক মৎস্য টাটকা মৎস্যের ন্যায় সুপাচ্য ও পুষ্টিকর নহে।

মাংস—আমিষজাতীয় খাদ্যের মধ্যে মাংস সর্বশ্রেষ্ঠ। এক শর্করাজাতীয় উপাদান ব্যতীত মাংসে শরীররক্ষার উপযোগী অন্য সমস্ত উপাদানই যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান আছে। মাংস অতি মুখরোচক ও সারবান্ খাদ্য। মাংসে যে আমিষজাতীয় উপাদান আছে, তাহা উদ্ভিজ্জাত খাদ্যের আমিষ উপাদান অপেক্ষা সহজে পরিপাকপ্রাপ্ত হয়। মসূর ডাইলে মাংসের চেয়ে বেশি আমিষ উপাদান আছে। কিন্তু এই আমিষ উপাদান মাংসের আমিষ উপাদানের মত সহজে হজম হয় না।

আমাদের দেশে ছাগ ও মেষের মাংসই বেশি ব্যবহৃত হয়। ছাগমাংস লঘুপাক; কিন্তু মেষমাংস অপেক্ষাকৃত গুরুপাক। আমাদের দেশে হাঁস, কবুতর, মুরগী প্রভৃতি পক্ষীর মাংসও ভক্ষিত হইয়া থাকে। কবুতর ও মুরগীর মাংস লঘুপাক; কিন্তু হাঁসের মাংস গুরুপাক।

মৎস্যের ন্যায় মাংসও টাটকা অবস্থায় খাওয়া উচিত। অতিরিক্ত মসলা দিয়া মাংস রন্ধন করিলে উহা গুরুপাক হইয়া পড়ে। পচা মাংস দুষ্পাচ্য। শিশু বা বৃদ্ধ পশুর মাংস তত পুষ্টিকর নহে। রুগ্ন পশুর মাংস কখনও ভক্ষণ করা উচিত নহে। কারণ উহার মাংসে রোগের জীবাণু থাকে।

ডিম্ব—ডিম্ব অতি পুষ্টিকর খাদ্য। ইহাতে যথেষ্ট পরিমাণে আমিষ ও তৈলজাতীয় উপাদান এবং ভিটামিন আছে। এজন্য ইহাকেও দুগ্ধের ন্যায় একটি পূর্ণখাদ্য বলা চলে। মাছ-মাংসে অনেক সময় নানাপ্রকার অনিষ্টকর পদার্থ থাকে কিন্তু ডিমে তাহা থাকে না। এজন্য ডিম কাঁচা খাইতেও কোন ভয় নাই। অর্দ্ধ-সিদ্ধ ডিম সহজপাচ্য। ডিম বেশী সিদ্ধ হইলে গুরুপাক হইয়া যায়।

ডিমের সাদা অংশ খুব লঘুপাক। এজন্য অনেক সময় ইহা জলের সহিত মিশাইয়া পথ্যরূপে রোগীকে দেওয়া হয়। ডিমের কুসুমে ক, খ ও ঘ-ভিটামিন আছে, এজন্য ইহা খুব পুষ্টিকর।

ডিম টাটকা অবস্থায় খাওয়া উচিত। পচা বা বেশী দিনের পুরাতন ডিম কখনও খাইতে নাই। পচা ডিম লবণাক্ত জলে ভাসে। এক গ্লাস জলে এক ছটাক লবণ মিশাইয়া তাহাতে ডিম ছাড়িয়া দিলে যদি ডুবিয়া যায়, তবে সে ডিম ভাল বলিয়া মনে করিবে।

চাউল—চাউল আমাদের প্রধান খাদ্য। ইহা হইতে ভাত, চিড়া, মুড়ি, খৈ প্রভৃতি নানাপ্রকার খাদ্য প্রস্তুত হয়। চাউলে অন্যান্য উপাদান অপেক্ষা শর্করাজাতীয় উপাদান অনেক বেশী পরিমাণে থাকে। আটা, ময়দা প্রভৃতি অন্যান্য শর্করাজাতীয় খাদ্য অপেক্ষা চাউল সহজপাচ্য এবং ইহার সমস্ত অংশই শরীরে গৃহীত হয়। চাউল প্রধানতঃ দুই প্রকার—সিদ্ধ ও আতপ। আতপ চাউল সিদ্ধ চাউল অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর।

চাউলের উপরে যে ঈষৎ লাল পাতলা আবরণ থাকে, তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন থাকে। কলের ছাঁটা সাদা চাউলে এই আবরণটি একেবারেই থাকে না; কিন্তু ঢেঁকিছাঁটা

চাউলে ইহা অনেক পরিমাণে থাকে। এজন্য কলে ছাঁটা সাদা চাউল ব্যবহার না করিয়া ঢেঁকিছাঁটা লাল চাউল ব্যবহার করা উচিত। দীর্ঘকাল কলের প্রস্তুত চাউল ব্যবহার করিলে ভিটামিনের অভাবে বেরিবেরি রোগ হয়।

ভাতের ফেন ফেলিয়া দিলে উহার সহিত চাউলের আমিষ ও লবণজাতীয় উপাদান এবং ভিটামিন অনেক পরিমাণে চলিয়া যায়। এজন্য রাঁধিবার সময়ে এরূপ পরিমাণে জল দেওয়া উচিত, যাহাতে ফেন ফেলিতে না হয়। আতপ চাউলের ভাতে যে পরিমাণ সার পদার্থ থাকে সিদ্ধ চাউলের ভাতে তাহা অপেক্ষা অনেক কম থাকে; কারণ ধান সিদ্ধ করিবার সময় চাউলের সারাংশ কিঞ্চিৎ পরিমাণে বাহির হইয়া যায়।

সুজি, আটা ও ময়দা—সুজি, আটা ও ময়দা গম হইতে প্রস্তুত হয়। চাউল অপেক্ষা গমে আমিষ ও তৈলজাতীয় উপাদান বেশি আছে বলিয়া সুজি, আটা ও ময়দা চাউল অপেক্ষা অধিক পুষ্টিকর।

ময়দা অপেক্ষা আটা পুষ্টিকর কিন্তু কিঞ্চিৎ গুরুপাক। যাঁতাভাঙ্গা লাল আটাতে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়। এজন্য যাহাদের কোষ্ঠকাঠিন্য আছে, তাহাদের এক বেলা এই আটার রুটি খাওয়া ভাল। কলের সাদা ময়দাতে ভিটামিন থাকে না। সুজির হালুয়া অতি পুষ্টিকর খাদ্য কিন্তু কিঞ্চিৎ গুরুপাক। রাত্রিতে ভাত না খাইয়া রুটি বা লুচি খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর।

ডাইল—আমাদের দেশে মুগ, মসুর, ছোলা, অড়হর, মটর, কলাই, খেসারী প্রভৃতি নানাপ্রকারের ডাইল ব্যবহৃত হয়।

ডাইল অতি পুষ্টিকর খাদ্য। ইহাতে আমিষজাতীয় উপাদান মাংস অপেক্ষাও বেশী পরিমাণে আছে। যাঁহারা মাছ-মাংস খান না, তাঁহাদের অধিক পরিমাণে ডাইল ভক্ষণ করিয়া খাদ্যে আমিষ উপাদানের অভাব পূরণ করা উচিত। ডাইল ভালরূপে সিদ্ধ না হইলে সহজে পরিপাক প্রাপ্ত হয় না। কাঁচা ডাইল ভাজা ডাইল অপেক্ষা লঘুপাক।

ডাইলের মধ্যে মুগ সর্বাপেক্ষা সহজপাচ্য। এজন্য ইহা রোগীর পথ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। সময় সময় মসূরের যুষও রোগীকে পথ্যরূপে দেওয়া হয়। মসূর ও কাঁচা কলাইয়ের ডাইল সহজে হজম হয়। মসূর ডাইলে আমিষজাতীয় উপাদান সর্বাপেক্ষা বেশি। খেসারী বাত বৃদ্ধি করে বলিয়া ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী নহে। ছোলার ডাইল খুব পুষ্টিকর কিন্তু অপেক্ষাকৃত গুরুপাক।

শুষ্ক অবস্থায় ডাইলে বেশী ভিটামিন থাকে না। ছোলা, মুগ, মটর প্রভৃতি অঙ্কুরিত হইলে ইহাদের মধ্যে ভিটামিনের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। এজন্য প্রত্যহ অঙ্কুরিত ছোলা বা মুগ ব্যবহার করিলে স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়।

চাউলের সহিত ডাইল মিশিয়া খিচুড়ি প্রস্তুত হয়। ইহা অতি উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্য। ইহা রাঁধিবার সময় ফেন ফেলিতে হয় না বলিয়া ডাইল ও চাউলের সারাংশ বাহির হইয়া যাইতে পারে না।

তরকারি—অধিকাংশ তরকারিতেই আমিষ ও তৈলজাতীয় উপাদান খুব কম। এজন্য এগুলির দ্বারা শরীরের পোষণ ও

বর্ধনের কোন সহায়তা হয় না কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের তরকারিতে লবণজাতীয় উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে থাকায় তাহাতে শরীরের রক্ত, রস প্রভৃতি প্রস্তুত ও পরিষ্কৃত হয়। টাটকা তরকারিতেও যথেষ্ট ভিটামিন থাকে। তরকারির খোসা, আঁশ প্রভৃতি অসার পদার্থ সহজে হজম হয় না, এগুলি মল বৃদ্ধি করে মাত্র। আমাদের দৈনিক খাদ্যে এই সমস্ত অসার পদার্থ কতক পরিমাণে থাকিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে। দীর্ঘকাল টাটকা তরকারি ও শাক-সবজি ব্যবহার না করিলে স্কার্ভি রোগ জন্মে। তরকারির মধ্যে গোল আলু অতি পুষ্টিকর খাদ্য। ইহাতে শরীররক্ষার উপযোগী প্রায় সমস্ত উপাদানই আছে। আলুর শর্করাজাতীয় উপাদান চাউলের শর্করাজাতীয় উপাদনের চেয়ে সহজে হজম হয়। আলুর আমিষ ও লবণজাতীয় উপাদান খোসার নীচেই থাকে। এজন্য খোসা ছাড়াইয়া আলু সিদ্ধ করিলে ইহার আমিষ ও লবণজাতীয় উপাদান অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া যায়। ভাজা আলু গুরুপাক ; কিন্তু সিদ্ধ আলু লঘুপাক।

আলু, কাঁচকলা, ওল, মানকচু, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মোচা, ইচড়, কাঁঠালবীচি, কলাইশুঁটি প্রভৃতিতে শর্করাজাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে আছে ; এজন্য এগুলি পুষ্টিকর খাদ্য। শিম, বরবটি, মটরশুঁটি প্রভৃতি ডাইলজাতীয় তরকারিতে আমিষ উপাদান বেশী পরিমাণে আছে বলিয়া ইহারা বেশি পুষ্টিকর।

লাউ, কুমড়া, ঝিঙা, পটোল, মূলা প্রভৃতিতে জলের ভাগই বেশি। কিন্তু টাটকা রাঁধিয়া খাইলে এগুলি হইতেও ভিটামিন সংগ্রহ করা যায়। মূলা খুব দুষ্পাচ্য কিন্তু বেগুন সহজপাচ্য।

তিক্তরস ভোজন করিলে ক্ষুধাবৃদ্ধি হয় ও যকৃতের ক্রিয়া ভাল থাকে। এজন্য উচ্ছে, করলা প্রভৃতি তরকারি এবং হিঞ্চে, পলতা, পাটপাতা প্রভৃতি শাক খুব উপকারী।

শাক—প্রায় সকল প্রকার শাকেই ভিটামিন থাকে। এজন্য আমাদের দৈনিক খাদ্যে কিছু টাটকা শাক-সবজি থাকা আবশ্যক। শাক কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখে। শাকের মধ্যে পালংশাক ও বাঁধা-কপি শ্রেষ্ঠ ; এগুলিতে ভিটামিনের পরিমাণ খুব বেশি। শাকের মধ্যে যে লবণজাতীয় উপাদান থাকে, তাহা রক্ত পরিষ্কার করে।

মসলা—আমরা খাদ্যের সঙ্গে লঙ্কা, হলুদ, জিরা, মরিচ, সরিষা, আদা, মেথি, ধনে, দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ প্রভৃতি নানা-প্রকার মসলা ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহাদের মধ্যে শরীররক্ষার উপযোগী পুষ্টিকর পদার্থ বিশেষ কিছুই নাই। খাদ্যকে সুস্বাদু ও সুগন্ধ করিবার জন্যই এগুলি ব্যবহৃত হয়। খাদ্যদ্রব্য সুস্বাদু হইলে আহারের সময় মুখ হইতে প্রচুর লালা ও পাকস্থলী হইতে আমাশয়-রস নির্গত হইয়া পরিপাক-ক্রিয়ার সহায়তা করে।

মসলা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করা ভাল নয়। ইহাতে খাদ্যদ্রব্য গুরুপাক হইয়া যায়। লঙ্কা, মরিচ, এলাচ, লবঙ্গ প্রভৃতি উগ্রবীর্য দ্রব্য বেশি খাইলে পাকস্থলী ও অন্ত্রের উত্তেজনা হইয়া অজীর্ণ, উদরাময় প্রভৃতি রোগ জন্মে। এজন্য খাদ্যদ্রব্যের সহিত মসলা যত কম ব্যবহার করা যায়, ততই ভাল।

ফল—আমাদের দেশে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সুস্বাদু ফল পাওয়া যায়। ফলের মধ্যে লবণ ও ভিটামিন অল্পাধিক পরিমাণে থাকে। এজন্য ফলে রক্ত পরিষ্কার করে

কোন কোন ফলে চিনির ভাগ বেশি থাকে; সেগুলি খাইতে যেমন মিষ্ট তেমনি পুষ্টিকর।

কাঁচা ফল সহজে হজম হয় না; পাকা ফল স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর। কিন্তু বেশী পাকা ফল খাওয়া উচিত নয়। ফল বেশী পাকিলে উহার পচনক্রিয়া আরম্ভ হয়।

আম খুব সুস্বাদু ও পুষ্টিকর বলিয়া ইহাকে ফলের রাজা বলা হয়। কাঁঠাল পুষ্টিকর কিন্তু গুরুপাক। কাঁচা কাঁঠালের তরকারি খুব পুষ্টিকর খাদ্য। কাঁঠালের বীচি গোল আলুর ন্যায় পুষ্টিকর।

পেঁপে খুব পুষ্টিকর; ইহা যকৃতের ক্রিয়ার সহায়তা করে। কাঁচা পেঁপের তরকারি খাওয়া যায়। কাঁচা পেঁপের মধ্যে প্যাপেন নামক এক প্রকার পাচক পদার্থ থাকে; ইহা মাংস-জাতীয় খাদ্যের পরিপাকের সহায়তা করে।

নারিকেল অতি উৎকৃষ্ট ফল। ঝুনা নারিকেলে পুষ্টিকর পদার্থ যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। নারিকেল হইতে যে তৈল বাহির করা হয়, তাহা কোন কোন স্থানে রন্ধনকার্যে ব্যবহৃত হয়। নারিকেল হইতে নানাপ্রকার মিষ্টদ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। ডাবের জল উপাদেয় ও নির্দোষ পানীয়। ইহা সময় সময় রোগীর পথ্যরূপে ব্যবহৃত হয়।

পাকা কলা খুব পুষ্টিকর কিন্তু কিঞ্চিৎ গুরুপাক। কাঁচকলা পুষ্টিকর তরকারি। পাকা বেল খাইলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। কাঁচা বেলপোড়া আমাশয়, উদারাময় প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়। আনারস খাদ্যদ্রব্য পরিপাকের সহায়তা করে এবং ক্রিমি নষ্ট করে। আনারসের পাতার রস ক্রিমিরোগের একটি উৎকৃষ্ট ঔষধ।

কমলা, বাতাবি, কাগজি ও পাতিলেবু স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। এগুলিতে ভিটামিন যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। ইহারা খাদ্যদ্রব্য পরিপাকের সহায়তা করে ও যকৃতের ক্রিয়া বৃদ্ধি করে।

আঙুর, বেদানা, ডালিম প্রভৃতি ফলের রসে যে শর্করাজাতীয় উপাদান আছে, তাহা সাধারণ চিনি অপেক্ষা সহজে হজম হয় বলিয়া এগুলি রোগীর পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাদাম, পেস্তা, আখরোট প্রভৃতি শুষ্ক ফলে আমিষ ও তৈলজাতীয় উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে আছে; এজন্য এসব ফল খুব পুষ্টিকর। কিস্‌মিস্‌, খেজুর প্রভৃতি ফলে শর্করাজাতীয় উপাদান বেশী পরিমাণে থাকে; এজন্য এ সব ফল পুষ্টিকর এবং কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে উপকারী।

লিচু, জাম, আতা, পেয়ারা, ন্যাসপাতি, আপেল প্রভৃতি ফল উৎকৃষ্ট। শসা, তরমুজ, কাঁকুড় প্রভৃতি অত্যন্ত গুরুপাক; এজন্য এগুলি বেশি না খাওয়াই ভাল।

আমাদের দেশের লোকে ফলের উপকারিতা বুঝে না। ছেলেমেয়েরা ফল অপেক্ষা মিষ্টদ্রব্যই বেশি পছন্দ করে। স্বাস্থ্যের পক্ষে ফল বাজারের মিঠাই অপেক্ষা অনেক বেশী হিতকর। আমাদের প্রত্যহ ফল খাওয়া উচিত।

অনুশীলনী

১। দুগ্ধকে 'আদর্শ খাদ্য' বলে কেন? গো-দুগ্ধ ও মহিষ-দুগ্ধে পার্থক্য কি? মাখন ও ছানার উপকারিতা কি?

২। কি কি কারণে ডিম মাছ-মাংস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ খাদ্য? ডিম টাটকা কি পচা তাহা নির্ণয় করার উপায় কি?

৩। চাউল অপেক্ষা আটা ও ময়দা বেশী পুষ্টিকর কেন? আটা ও ময়দার মধ্যে কোন্‌টি বেশী পুষ্টিকর?

৪। তরকারির উপকারিতা কি? আমরা খাদ্যদ্রব্য মসলা সংযোগে রন্ধন করি কেন?

চতুর্থ অধ্যায়
নিয়মিত ভোজনের আবশ্যকতা

শরীরের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন এবং তাপ ও শক্তি উৎপাদনের উদ্দেশ্যেই আমরা আহার করি। এই সমস্ত উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কোন্ প্রকার খাদ্য কি পরিমাণে আহার করা আবশ্যক, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় খাদ্য উপযুক্ত পরিমাণে আহার করিলেই শরীরের রীতিমত পুষ্টি ও বৃদ্ধিসাধন হয় না। আমরা যে খাদ্যদ্রব্য ভোজন করি তাহা শরীরের মধ্যে উত্তমরূপে জীর্ণ হইলে উহার সারাংশ শরীরে গৃহীত হইয়া শরীরের পোষণ বর্ধন করে এবং অসারাংশ মলমূত্ররূপে শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়। খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে পরিপাকপ্রাপ্ত না হইলে উহার উপাদানগুলি শরীরে গৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং ভুক্তদ্রব্য যাহাতে উত্তমরূপে জীর্ণ হইতে পারে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা একান্ত কর্তব্য। ভুক্তদ্রব্যের পরিপাকের সুবিধার জন্য আমাদের আহার সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলা আবশ্যক। এই সমস্ত নিয়মের মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটিই প্রধান—

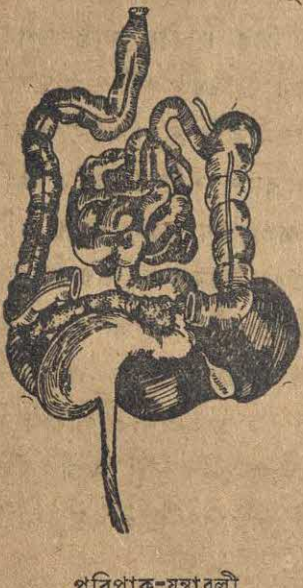
(১) **নিয়মিত সময়ে ভোজন।**

(২) **স্বাস্থ্যকর নিয়মে ভোজন।**

(৩) **নিয়মিত খাদ্যাদি ভোজন।**

নিয়মিত সময়ে ভোজন—প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে আহার করা উচিত। যাহার যে সময়ে আহার করার অভ্যাস, তাহার

প্রত্যহ ঠিক সেই সময়ে ক্ষুধা পায়। ক্ষুধার সময়ে আহার করিলে পাকস্থলী হইতে উপযুক্ত পরিমাণে আমাশয়-রস নির্গত হয়। আহারের নির্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া গেলে ক্ষুধা পড়িয়া যায়। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে আহার করিলে রীতিমত ক্ষুধা পায় না বলিয়া পাকস্থলী হইতে উপযুক্ত পরিমাণে আমাশয়-রস নিঃসৃত হয় না এবং ভুক্তদ্রব্যও উত্তমরূপে জীর্ণ হয় না। ফলে অজীর্ণ, উদরাময় প্রভৃতি রোগ জন্মিয়া থাকে। সুতরাং প্রত্যেকেরই আহারের জন্য নির্দিষ্ট সময় থাকা আবশ্যক। যাহার দশটার সময় আহার করা অভ্যাস সে প্রতিদিনই দশটার সময় আহার করিবে; যাহার বারোটার সময় আহার করা অভ্যাস, সে প্রত্যহই বারোটার সময় আহার করিবে। কিন্তু মনে রাখিবে, ক্ষুধার উদ্রেক না হইলে কখনও খাইতে নাই। ভোজনের নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইলেও যদি ক্ষুধার উদ্রেক না হয়, তবে তখনও আহার না করাই উচিত।



পরিপাক-যন্ত্রাবলী

দিবারাত্রিতে কতবার আহার করিতে হইবে এ সম্বন্ধে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম খাটে না। বয়স, শরীরের অবস্থা, পরিশ্রমের মাত্রা

ও ব্যক্তিগত অভ্যাস অনুসারে ইহার তারতম্য হইয়া থাকে। শিশুদের দুই ঘণ্টা অন্তর, বালকদের চারি ঘণ্টা অন্তর এবং পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিদের ছয় ঘণ্টা অন্তর আহারের আবশ্যক হয়। আমরা সচরাচর যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য আহার করি, তাহা জীর্ণ হইতে সাধারণতঃ ৪।৫ ঘণ্টা সময় লাগে। ইহার পর পাকস্থলীকে এক ঘণ্টা কাল বিশ্রাম দেওয়া উচিত। সুতরাং **একবার পূর্ণ মাত্রায় ভোজন করিবার পর অন্ততঃ ছয় ঘণ্টার মধ্যে আর ভোজন করা উচিত নয়।** জলযোগের পরেও অন্ততঃ দুই ঘণ্টার মধ্যে অন্য কিছু আহার করা উচিত নয়।

আমাদের দেশে দিবারাত্রির মধ্যে দুইবার ভোজন করার প্রথাই বেশি প্রচলিত। কিন্তু কৃষক ও মজুর শ্রেণীর লোকেরা দিবসে তিনবার ভোজন করিয়া থাকে। বেশী শারীরিক পরিশ্রম করিতে হয় বলিয়া দুইবার ভোজনে তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না। হিন্দু-বিধবাগণ দিবসে একবার মাত্র আহার করিয়া সুস্থ-দেহে দীর্ঘজীবন লাভ করেন। এ সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অভ্যাসের উপর অনেকটা নির্ভর করিতে হয়। যাহার দুই বেলা খাওয়ার অভ্যাস, এক বেলা খাইলে তাহার শরীর দুর্বল হইয়া পড়ে। যাহার দুই বেলা খাওয়ার অভ্যাস, তিন বেলা খাইলে তাহার ভুক্তদ্রব্য রীতিমত জীর্ণ হয় না এবং ফলে অজীর্ণ, উদরাময় প্রভৃতি রোগ জন্মে। সুতরাং এ সম্বন্ধে যাহার যেরূপ অভ্যাস তাহার সেই ভাবেই চলা উচিত।

স্বাস্থ্যকর নিয়মে ভোজন—অনেক সময় আহারের নিয়মের দোষে ভুক্তদ্রব্য রীতিমত জীর্ণ হয় না এবং ফলে উক্ত

খাদ্যদ্রব্য দ্বারা শরীরের রীতিমত পুষ্টি ও বৃদ্ধিসাধন হয় না। আহার সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মানিয়া চলিলে ভুক্তদ্রব্য উত্তমরূপে পরিপাকপ্রাপ্ত হইবে এবং স্বাস্থ্যরক্ষার কোন ব্যাঘাত ঘটিবে না।

(১) কখনও তাড়াতাড়ি আহার করিবে না। খাবার জিনিষ ভালরূপে চিবাইয়া ধীরে ধীরে আহার করিবে। তাড়াতাড়ি খাইলে খাদ্যদ্রব্য সূক্ষ্ম অংশে বিভক্ত হয় না; এজন্য মুখের লালা উহার সহিত ভালরূপে মিশিতে পারে না। ইহাতে পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। বালক-বালিকারা অনেক সময় খাবার জিনিষ মুখে দিয়াই গিলিয়া ফেলে। ইহা নিতান্ত কু-অভ্যাস।

(২) খুব বেশী উষ্ণ বা বেশী শীতল অন্ন-ব্যঞ্জন খাইতে নাই। রন্ধনের অল্প পরেই আহার করা উচিত। রন্ধনের বেশী পরে ভোজন করিলে খাদ্যদ্রব্য ঠাণ্ডা হইয়া যায় এবং উহাতে মাছি বা ধূলাবালি পড়িয়া দূষিত হইবার সম্ভাবনা থাকে

(৩) আহারের সময় অধিক জল পান করিবে না। বেশি জল পান করিলে পাকস্থলীর আমশয়-রস জলের সহিত মিশিয়া শক্তিহীন হইয়া পড়ে; ফলে পরিপাকক্রিয়া রীতিমত চলে না। সুতরাং আহারের সময় বেশি জল পান না করিয়া আহারের দুই ঘণ্টা পূর্বে বা দুই ঘণ্টা পরে জল পান করা বিধেয়।

(৪) আহারের সময় মন বেশ প্রফুল্ল থাকা উচিত। ভোজনের স্থান, বসিবার আসন ও বাসন প্রভৃতি পরিষ্কৃত থাকিলে মনে স্ফূর্তি আসে এবং আহারের রুচি হয়। আহারের সময় মন

বিষণ্ণ থাকিলে বা ক্রোধের উদ্রেক হইলে আহারের বেশি প্রবৃত্তি হয় না এবং মুখ হইতে প্রচুর পরিমাণে লালা এবং পাকস্থলী হইতে উপযুক্ত পরিমাণে আমাশয়-রস নির্গত হয় না। ইহাতে পরিপাকের ব্যাঘাত ঘটে।

(৫) আহারের ঠিক পরেই নিদ্রা যাইবে না। নিদ্রিতাবস্থায় পাকস্থলী হইতে যথেষ্ট পরিমাণে আমাশয়-রস নিঃসৃত হয় না। এজন্য আহার করিয়াই নিদ্রা গেলে হজমের ব্যাঘাত হয়। পূর্ণ আহারের অন্ততঃ দুই ঘণ্টা পরে নিদ্রা যাওয়া উচিত। এই সময়ের মধ্যে ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলী হইতে ক্ষুদ্র অন্ত্রে চলিয়া যায়। তখন আর পরিপাকের কোন ব্যাঘাত হয় না।

(৬) ভোজনের পূর্বে এবং পরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা উচিত। বেশী পরিশ্রমের কাজ করিয়া অসিয়া তৎক্ষণাৎ খাইতে বসা উচিত নয়। আহারের পর আধ ঘণ্টা কাল বিশ্রাম না করিয়া কোন পরিশ্রমের কাজ করা উচিত নয়। আহারের পর কিছুকাল বিশ্রাম না করিয়া কোনও স্থানে ছুটিবে না। ইহাতে পরিপাকক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে।

(৭) খাওয়ার সময় খাওয়া ভিন্ন অন্য কোন কজ করিবে না। আহারের সময় বেশি গল্প করিলে খাদ্যদ্রব্য উত্তমরূপে চর্বিত হয় না।

(৮) কখনও খুব বেশী বা কম আহার করিবে না। ক্ষুধার নিবৃত্তি হইলেই আহার বন্ধ করিবে। ক্ষুধা-নিবৃত্তির পরও আহার করিলে পাকস্থলী অতিরিক্ত মাত্রায় ভারাক্রান্ত হইয়া পড়ে। ইহাতে পাকস্থলীর কার্য বৃদ্ধি পায় এবং ভুক্ত

দ্রব্য রীতিমত জীর্ণ হয় না। ফলে অজীর্ণ, উদরাময় প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়।

(৯) ভোজনের সময়ে প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ থালা, গ্লাস ইত্যাদি ব্যবহার করিবে। কখনও একই পাত্রে অনেকে ভোজন করিবে না। ইহাতে একজনের হাত অপরিষ্কৃত থাকিলে অপরের খাদ্য দূষিত হইয়া পড়ে; এবং একজনের কোন রোগ থাকিলে অপরের দেহে তাহা সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

নিয়মিত খাদ্যাদি ভোজন—অভ্যাসের শক্তি নিতান্ত কম নয়। যে যেরূপ কাজ করিতে অভ্যস্ত, তাহার পক্ষে সেরূপ কাজ কঠিন বলিয়া মনে হয় না। আবার যে যেরূপ কাজ করিতে অভ্যস্ত নয়, তাহার পক্ষে সেরূপ কাজ নিতান্ত কঠিন বোধ হয়। ডাক-হরকরা দৈনিক ৮।১০ মাইল পথ হাঁটিয়াও কোনরূপ কষ্ট বোধ করে না। কিন্তু তোমরা একদিন ১০ মাইল রাস্তা হাঁটিলে হয়ত পায়ের ব্যথায় নড়িতেই পারিবে না। কুলিরা সারাদিন মাটি কাটিয়াও কোনরূপ কষ্ট অনুভব করে না, কিন্তু তোমরা আধ ঘণ্টা মাটি কোপাইলেই হাতে ব্যথা অনুভব করিবে। ইহাতে বুঝা যায় যে, যাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেরূপ কাজ করিতে অভ্যস্ত, সেরূপ কাজ করিতে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশেষ কোন কষ্ট হয় না। এইজন্যই লোকে কথায় বলে, "শরীরের নাম মহাশয়, যা' সহান যায় তা'ই সয়।"

আমাদের হাত-পা প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেমন অভ্যাসের অধীন, আমাদের শরীরের যন্ত্রসমূহও সেইরূপ অভ্যাসের অধীন। আমরা যেরূপ খাদ্যদ্রব্য আহার করি, আমাদের পরিপাক-যন্ত্রও

সেইরূপ খাদ্যদ্রব্য পরিপাক করিতে অভ্যস্ত হয়। যে কোন দিন মাছ-মাংস খায় না, সে যদি হঠাৎ একদিন মাছ-মাংস খায়, তাহা হইলে এই অনভ্যস্ত খাদ্য জীর্ণ করিতে তাহার পরিপাক-যন্ত্রের বিশেষ বেগ পাইতে হইবে। যদি তোমা৲ রাত্রিতে দুধ খাওয়ার অভ্যাস না থাকে, তাহা হইলে হঠাৎ একদিন রাত্রিতে দুধ খাইলে তোমার পরিপাক-যন্ত্র হয়ত তাহা পরিপাক করিতে পারিবে না, ফলে তোমার অসুখ করিবে। ইহাতে আমরা বুঝিতে পারি যে, আমরা বরাবর যে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য আহার করিতে অভ্যস্ত, সেই সমস্ত খাদ্যই নির্দিষ্ট পরিমাণে আহার করা আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর।

অভ্যস্ত খাদ্য জীর্ণ করা পরিপাক-যন্ত্রের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ হইলেও মধ্যে মধ্যে খাদ্য পরিবর্তন করা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল। মনে কর, তুমি প্রত্যহ মাছ ও ডাইল খাও; ৭।৮ দিন পর একদিন মাংস বা ডিম খাইলে তোমার আহারের রুচি বেশি হইবে। কিন্তু বরাবর মাছ ও ডাইল খাইয়া হঠাৎ একদিন মাংস খাইতে হইলে, মাছ ও ডাইলের পরিমাণ কমাইতে হইবে এবং মাংস অল্প পরিমাণে আহার করিতে হইবে। আমাদের দেশে অনেকে মাংস খাইয়া দুধ খায় না। মাংস ও দুধ এই উভয় খাদ্যেই আমিষজাতীয় উপাদান যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। সুতরাং মাংসের পর দুধ খাইলে খাদ্যে আমিষ উপাদানের পরিমাণ বাড়িয়া যায় এবং এই অতিরিক্ত আমিষজাতীয় উপাদান জীর্ণ করা পরিপাক-যন্ত্রের পক্ষে কঠিন হইয়া পড়ে। অতএব মনে রাখিবে, খাদ্য পরিবর্তন কালে নূতন খাদ্যটি যে জাতীয় সেই

জাতীয় অপর কোন খাদ্য সম্পূর্ণ বাদ দিতে হইবে অথবা উহার পরিমাণ কমাইতে হইবে।

উপবাসের উপকারিতা—আমরা প্রত্যহ ২।৩ বার পূর্ণ-মাত্রায় আহার ও সকালে বিকালে জলযোগ করিয়া থাকি। এই সমুদয় খাদ্য পরিপাক করিতে পরিপাক-যন্ত্রের প্রায় সারাদিনই পরিশ্রম করিতে হয়। পরিশ্রমের পর আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের যেরূপ বিশ্রাম আবশ্যক, শরীরের যন্ত্রাদিরও সেইরূপ বিশ্রাম দরকার। তোমরা প্রতি সপ্তাহে ছয় দিন বিদ্যালয়ে যাও, একদিন বিশ্রাম কর। সেইরূপ **মধ্যে মধ্যে উপবাস করিলে আমাদের পরিপাক-যন্ত্র বিশ্রামলাভ করিতে পারে।**

আমরা দৈনিক যে খাদ্যদ্রব্য আহার করি, তাহাতে খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের পরিমাণ সকল সময় ঠিক থাকে না। কোন দিন বা আমরা শর্করাজাতীয় খাদ্য বেশি ভোজন করিয়া ফেলি, কোন দিন বা আনিষজাতীয় উপাদন বেশি ভোজন করি, আবার কোন দিন বা তৈলজাতীয় উপাদান অধিক পরিমাণে আহার করি। কোন এক জাতীয় খাদ্য বেশী পরিমাণে আহার করিলে উহার সমস্ত অংশ পরিপাক হয় না এবং ঐ অপরিপক্ক অংশ হইতে শরীরে নানা প্রকার দূষিত পদার্থ উৎপন্ন হয়। দীর্ঘকাল এই সমস্ত পদার্থ সঞ্চিত হইতে থাকিলে নানা প্রকার রোগ জন্মে। আমরা নাসিকা দ্বারা যে বায়ু গ্রহণ করি, তাহাতে যে অম্লজান থাকে, তাহা ভুক্তদ্রব্যকে শরীরমধ্যে মৃদুভাবে দগ্ধ করিয়া তাপ ও শক্তি উৎপাদন করে। মধ্যে মধ্যে উপবাস

করিলে এই অম্লজান খাদ্যদ্রব্যের অভাবে শরীরমধ্যে সঞ্চিত দূষিত পদার্থসমূহ দগ্ধ করিয়া নষ্ট করিয়া ফেলে। এজন্য মধ্যে মধ্যে উপবাস করা স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর। হিন্দু-বিধবারা একাদশী করেন বলিয়া তাঁহাদের অসুখ-বিসুখ অপেক্ষাকৃত কম। অনেকে পূর্ণিমা ও অমাবস্যা রাত্রিতে আহার করেন না ; ইহাও খুব ভাল প্রথা।

মধ্যে মধ্যে উপবাস করা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল হইলেও দীর্ঘ উপবাস বা ২।৪ দিন অন্তর অন্তর উপবাস করা ভাল নয়। দীর্ঘ উপবাসে শরীর দুর্বল হইয়া পড়ে এবং পরিপাক-যন্ত্রের শক্তি কমিয়া যায়। পূর্বেই বলা হইয়াছে, আমাদের শরীরের ভিতরে অম্লজানের দহনক্রিয়া অনবরতই চলিতেছে। সুতরাং বেশী উপবাস করিলে অম্লজান খাদ্যদ্রব্যের অভাবে শরীরের বিভিন্ন অংশ দগ্ধ করিয়া ক্ষয় করে।

অনুশীলনী

১। প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে ভোজনের আবশ্যকতা কি ?

২। পরিপাকক্রিয়ার সহায়তার নিমিত্ত কি কি নিয়ম পালন করা আবশ্যক ?

৩। যে খাদ্য বরাবর খাওয়া হয় না, তাহা খাইতে হইলে কি নিয়ম পালন করা উচিত ?

৪। উপবাসের উপকারিতা কি ? বেশী উপবাস করিলে কি হয় ?

পঞ্চমঅধ্যায়

অপরিমিত পানাহারের অপকারিতা

অতি-ভোজনের অপকারিতা—অতি-ভোজন শরীরের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। ইহাতে নানাপ্রকার পীড়া জন্মে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্যদ্রব্য আহার করিলে উহা জীর্ণ করিবার জন্য পরিপাক-যন্ত্রকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়। প্রত্যেক প্রাণী বা কল-কব্জারই কার্য করিবার শক্তির একটা মাত্রা আছে। অতিরিক্ত খাটাইলে উহা কিছুদিন পরে দুর্বল ও অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। আমাদের পরিপাক-যন্ত্র ও শরীরস্থ অন্যান্য যন্ত্র সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই খাটে। অতিরিক্ত ভোজন করিলে দিন দিন উহার কাজ করিবার শক্তি কমিয়া যায়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভোজন করিলে পরিপাক-যন্ত্র ক্রমশঃ এত দুর্বল ও অকর্মণ্য হইয়া পড়ে যে, শরীররক্ষার জন্য যে পরিমাণ খাদ্যের আবশ্যক, উহা তাহাও হজম করিতে পারে না। ফলে অপরিপক্ক খাদ্য অন্ত্রের মধ্যে জমিয়া পেটফাঁপা, অজীর্ণ, উদরাময় রোগ উৎপন্ন করে।

অতিরিক্ত খাদ্য পরিপাকপ্রাপ্ত হইলেও উহা দ্বারা শরীরের কোন উপকার হয় না, বরং অপকারই হইয়া থাকে। অতিরিক্ত আমিষজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করিলে অতিরিক্ত আমিষ উপাদান রক্তের সহিত মিশিয়া থাকে। রক্তের অনাবশ্যক উপাদানকে বাহির করিয়া রক্তকে পরিষ্কার রাখা যকৃতের একটি প্রধান কার্য। সুতরাং এই অনাবশ্যক আমিষজাতীয় পদার্থকে বাহির

করিতে যকৃতের অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়। ইহাতে যকৃৎ ক্রমশঃ দুর্বল ও অকর্মণ্য হইয়া পড়ে এবং অজীর্ণ, উদরাময়, বাত প্রভৃতি নানা প্রকার রোগ দেখা দেয়। তৈল ও শর্করা-জাতীয় খাদ্য অতিরিক্ত পরিমাণে আহার করিয়া উপযুক্ত পরিমাণে পরিশ্রম না করিলে খাদ্যের অতিরিক্ত অংশ মেদে পরিণত হইয়া শরীরে জমা হইতে থাকে। ইহাতে শরীর অস্বাভাবিকরূপে মোটা হইয়া পড়ে। অতিরিক্ত পরিমাণে শর্করাজাতীয় খাদ্য গ্রহণ করিলে বহুমূত্র রোগ জন্মিয়া থাকে।

অনেকে নিমন্ত্রণে যাইয়া মাত্রার অতিরিক্ত খাইয়া ফেলে। যুবকদের মধ্যে অনেকে বাজি রাখিয়া ২।৩ সের রসগোল্লা বা একটা আস্ত কাঁঠাল খাইয়া ফেলে। অনেক সময় ইহার ফল হাতে হাতেই পাওয়া যায়। তখন তখনই ইহার কু-ফল বুঝা না গেলেও দীর্ঘকাল এরূপভাবে চলিলে প্রৌঢ় বয়সে ইহার ফল ভোগ করিতে হয়। অনেকে যৌবনকালে অতিরিক্ত পরিমাণে ভোজন করিয়াও কোনরূপ অসুস্থতা বোধ করে না; তখন শরীরের যন্ত্রসমূহ সবল ও সতেজ থাকে বলিয়াই কোনরূপ পীড়া দেখা দেয় না। কিন্তু দীর্ঘকাল শরীরের উপর এরূপ অত্যাচার করিলে প্রৌঢ় বয়সে অজীর্ণ বহুমূত্র, বাত প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

আমাদের দেশে কৃষক ও মজুর শ্রেণীর লোকেরা পরিশ্রমের তুলনায় যে পরিমাণে আহার করে, ধনী লোকেরা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে আহার করিয়া থাকেন। এইজন্যই ধনী লোকদের মধ্যে ডিস্পেপ্‌সিয়া বা অজীর্ণ রোগের প্রাদুর্ভাব এত

বেশি দেখা যায়। **অল্প-ভোজনে যত লোক মারা যায়, অতি-ভোজনে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী লোক মারা যায়**

অল্প-ভোজনের অপকারিতা—অতি-ভোজনে যেরূপ নানা প্রকার রোগ জন্মে, অল্প-ভোজনেও সেরূপ নানাবিধ রোগ জন্মে। শরীররক্ষার জন্য যে পরিমাণ খাদ্যের আবশ্যক, তাহার অপেক্ষা কম খাদ্য গ্রহণ করিলে শরীরের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি-সাধন হয় না ; ইহাতে শরীর ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়ে। দুর্বল শরীরে রোগ যত সহজে আক্রমণ করিতে পারে, সবল শরীরে তত সহজে পারে না। দীর্ঘকাল প্রয়োজনের চেয়ে কম পরিমাণে আহার করিলে পরিপাক-যন্ত্রের কার্য করিবার শক্তি কমিয়া যায়। ক্রমশঃ ইহা এত দুর্বল ও অকর্মণ্য হইয়া পড়ে যে উপযুক্ত পরিমাণে খাদ্য গ্রহণ করিলেও উহার আর সে খাদ্য হজম করিবার ক্ষমতা থাকে না।

মধ্যে মধ্যে এক আধ দিন অল্প পরিমাণে আহার করিলে বা উপবাস করিলে শরীরের কোন ক্ষতি হয় না বটে, কিন্তু দীর্ঘকাল প্রয়োজনের চেয়ে কম পরিমাণে আহার করিলে শরীররক্ষার উপযোগী উপাদানসমূহ উপযুক্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না, সুতরাং স্বাস্থ্যরক্ষাও হয় না।

অধ্যশনের অপকারিত—একবারের ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইবার পূর্বে পুনরায় আহার করার নাম **অধ্যশন**। রোগের উৎপত্তির যে সমস্ত কারণ আছে, তাহার মধ্যে অধ্যশন প্রধান। আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি যে, একবারের ভুক্তদ্রব্য রীতিমত

জীর্ণ হইতে ৪।৫ ঘণ্টা সময় লাগে। ইহার পরও পরিপাক-যন্ত্রকে এক ঘণ্টা কাল বিশ্রাম দেওয়া আবশ্যক। সুতরাং একবার পূর্ণমাত্রায় ভোজনের পর ২।৩ ঘণ্টার মধ্যে পুনরায় ভোজন করিলে পরিপাক-যন্ত্র বিশ্রাম ত' পায়ই না, বরং উহাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়। এই অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে পরিপাক-যন্ত্র দিন দিন দুর্বল ও অকর্মণ্য হইয়া পড়ে এবং পরিণামে অজীর্ণ, উদরাময়, বাত প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়।

অনেকে যখন যাহা পায় তাহাই খায়; ইহা নিতান্ত কু-অভ্যাস। নির্দিষ্ট সময় ছাড়া অন্য সময়ে আহার বা জলযোগ করিতে নাই। প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে আহার এবং জলযোগ করিলে ভুক্তদ্রব্য উত্তমরূপে জীর্ণ হয় এবং স্বাস্থ্যরক্ষার কোন ব্যাঘাত ঘটে না।

অপরিমিত পানীয় গ্রহণের অপকারিতা—অতিরিক্ত ভোজন যেরূপ স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী, অতিরিক্ত পানীয়-গ্রহণও স্বাস্থ্যের পক্ষে সেইরূপ অপকারী। শরীররক্ষার জন্য বায়ুর পরেই জলের প্রয়োজন। আমরা আহার না করিয়া ২।৩ সপ্তাহ বাঁচিয়া থাকিতে পারি কিন্তু জলপান না করিয়া ২।৩ দিনও বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। বিশুদ্ধ জল স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে এত দরকারী হইলেও অতিরিক্ত জল পান করা শরীরের পক্ষে অহিতকর। আহারের সময়ে বেশী জল পান করিলে আমাশয়-রসের তীব্রতা কমিয়া যায়; ইহাতে পরিপাকের ব্যাঘাত হয়। এইজন্য **আহারের দুই ঘণ্টা পূর্বে বা দুই ঘণ্টা পরে জল পান করা স্বাস্থ্যের পক্ষে হিতকর।**

আবার শরীররক্ষার জন্য প্রত্যহ যে পরিমাণ জলের প্রয়োজন, তাহা অপেক্ষা কম জল পান করিলে পরিপাকক্রিয়া প্রভৃতি শারীরিক ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। তাহা ছাড়া শরীরের দূষিত পদার্থ মলমূত্র ও ঘর্মরূপে রীতিমত নির্গত হইতে পারে না। অনেক সময় শরীরের ভিতর নানা প্রকার দূষিত পদার্থ আটকাইয়া যাইবার ফলে আমাদের জ্বর ও অন্যান্য পীড়া জন্মে। জ্বর হইলে ঘন ঘন জলপান করা উচিত। ইহাতে প্রস্রাবের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় বলিয়া শরীরের দূষিত পদার্থ বাহির হইয়া যাইবার সুবিধা হয়।

আজকাল শহর-অঞ্চলে চা, কফি প্রভৃতি নানা প্রকার পানীয় প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের কোন গুণ নাই। যাহারা বেশী পরিমাণে চা বা কফি পান করে, তাহাদের অজীর্ণ রোগ হইতে দেখা যায়।

অনুশীলনী

১। অতি-ভোজনের অপকারিতা কি?

২। আমিষ, তৈল ও শর্করাজাতীয় খাদ্য অধিক পরিমাণে আহার করিলে শরীরের কি অনিষ্ট হয়?

৩। প্রয়োজনের চেয়ে কম জল পান করা শরীরের পক্ষে অপকারী কেন?

ষষ্ঠ অধ্যায়

খাদ্যে ভেজাল

অসাধু ব্যবসায়ীরা অধিক লাভের আশায় বেশী দামের খাবার জিনিষের সঙ্গে কম দামের সেই জাতীয় বা সম্পূর্ণ অন্য জাতীয় জিনিষ মিশাইয়া বাজারে বিক্রয় করে। এইরূপ খাদ্যকে **ভেজাল খাদ্য** বলে।

ভেজাল জিনিষ খাঁটি জিনিষ অপেক্ষা সস্তা দরে বিক্রয় হয় বলিয়া আমরা সেই সমস্ত জিনিষ কিনি। আমরা এক সের দুধ তিন আনায় পাইলে চারি আনা দিয়া কিনিতে চাই না। কিন্তু এই এক সের দুধে হয়ত দেড় পোয়া জল মিশান আছে। তাহা হইলে তিন আনা দিয়া মাত্র আড়াই পোয়া দুধ পাইলাম, আর বাকী দেড় পোয়া এমন জিনিষ পাইলাম যাহার কোন মূল্যই নাই। এই দেড় পোয়া জল যদি বিশুদ্ধ জল হয়, তাহা হইলে মন্দের ভাল। আর যদি উহা কোন ডোবা বা পচা পুকুরের দূষিত জল হয়, তাহা হইলে আড়াই পোয়া দুধের দ্বারা শরীরের যে উপকার হইবে, দেড় পোয়া দূষিত জলের দ্বারা তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী অপকার হইবে। মূল্য হিসাবেও ইহাতে কোন লাভ হইবে না। যদি খাঁটি দুধের সের চারি আনা হয়, তাহা হইলেও তিন আনায় তিন পোয়া দুধ পাওয়া যাইবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তিন আনায় মাত্র আড়াই পোয়া দুধ পাইলাম। আর উহার সহিত যে দেড় পোয়া দূষিত জল পাইলাম, তাহাতে যে কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের জীবাণু না আছে,

তাহা কে বলিতে পারে? সুতরাং পয়সা দিয়া ভেজাল জিনিষ ক্রয় করা আর রোগ ডাকিয়া আনা একই কথা।

পল্লীগ্রাম অপেক্ষা শহরেই ভেজাল খাদ্যদ্রব্যের প্রচলন অধিক। শহরে সাধারণতঃ খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বেশি থাকে বলিয়া অসাধু ব্যবসায়ীরা অধিক মূল্যের খাদ্যদ্রব্যের সহিত অল্প মূল্যের খাদ্যদ্রব্য মিশ্রিত করিয়া উহা অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে বিক্রয় করে। আজকাল প্রায় সমস্ত খাদ্যদ্রব্যেই অল্পাধিক ভেজাল দেওয়া হইয়া থাকে। চাউল, ডাইল, আটা, ময়দা, চিনি প্রভৃতিতে অনেক সময় বেশী ভেজাল থাকে না; কিন্তু দুগ্ধ, মাখন, তৈল প্রভৃতি কতকগুলি খাদ্যে প্রায়ই ভেজাল থাকে। ব্যবসায়ীরা যে কত রকমে খাদ্যদ্রব্যে ভেজাল দেয়, তাহা নির্ণয় করা বড়ই কঠিন। অনেক সময় বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা ইহাদের বিশুদ্ধি নির্ণয় করিতে হয়। কিন্তু এরূপ পরীক্ষা সকল স্থানে ও সকল সময়ে সম্ভবপর হয় না। আমাদের নিত্যব্যবহার্য যে সমস্ত খাদ্যে সাধারণতঃ ভেজাল থাকে, তাহাদের সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হইল।

দুগ্ধে ভেজাল—১। দুগ্ধের প্রধান ভেজাল জল। এই জল প্রায়ই বিশুদ্ধ হয় না। পল্লীগ্রামের দুগ্ধ-বিক্রেতারা প্রায়ই খাল, বিল, ডোবা ও পুকুরের জল দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত করে। এরূপ দূষিত-জলমিশ্রিত দুগ্ধ পান করার ফলে অনেক সময় কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি সংক্রামক রোগের বিস্তার ঘটে।

২। অনেক সময় দুগ্ধ হইতে মাখন তুলিয়া ফেলিয়া সেই দুগ্ধ বিক্রয় করা হয়। মাখন-তোলা দুধকে ভেজাল দুধ বলা

না গেলেও খাঁটি দুধ বলা যায় না। জল মিশাইলে বা মাখন তুলিয়া ফেলিলে দুধ পাতলা হইয়া যায়। এজন্য গোয়ালারা কখন কখন জল-মিশান বা মাখন-তোলা দুধের সহিত চিনি, ময়দা আটা, এরারুট প্রভৃতি মিশাইয়া উহাকে ঘন করিয়া থাকে।

৩। মহিষ-দুগ্ধ গো-দুগ্ধ অপেক্ষা ঘন। এজন্য সময় সময় গোয়ালারা মহিষ-দুগ্ধের সহিত জল মিশ্রিত করিয়া অথবা গো-দুগ্ধের সহিত জল ও মহিষ-দুগ্ধ মিশ্রিত করিয়া উহা গো-দুগ্ধ বলিয়া বিক্রয় করে।

দুগ্ধের বিশুদ্ধি পরীক্ষা—দুধে জল মিশান আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করার জন্য ল্যাক্টো-মিটার বা দুগ্ধমান যন্ত্র নামক এক প্রকার যন্ত্র ব্যবহৃত হয় (চিত্র দেখ)। যন্ত্রটি দেখিতে একটি বড় থার্মোমিটারের মত। ইহার গায়ে দাগ কাটা আছে। একটি লম্বা পাত্রে দুধ রাখিয়া কলটি উহার মধ্যে ডুবাইলে দুগ্ধের উপরিভাগ যন্ত্রের M চিহ্নটি স্পর্শ করিবে। যদি দুধে জল থাকে, তবে কলটি আরও বেশী ডুবিয়া যাইবে। কোন্ দাগ পর্যন্ত ডুবিয়া যায়, তাহা দেখিয়া দুগ্ধে জলের পরিমাণ নির্ণয় করা



দুগ্ধমান যন্ত্র

যায়। একটি জলপূর্ণ পাত্রে কলটি ডুবাইলে জলের উপরিভাগ যন্ত্রের গায়ে W চিহ্নটি স্পর্শ করিবে।

দুগ্ধে জল মিশ্রিত থাকিলে দুগ্ধমান যন্ত্র দ্বারা তাহা ধরা যায়। কিন্তু জলমিশ্রিত দুগ্ধে চিনি বা ময়দা মিশাইয়া দিলে উহার গুরুত্ব বাড়িয়া যায় এবং দুগ্ধমান যন্ত্র দ্বারা উহার কৃত্রিমতা ধরা যায় না। কিন্তু ল্যাক্টোস্কোপ বা দুগ্ধবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা এরূপ দুগ্ধের কৃত্রিমতা নির্ণয় করা যায়। এই যন্ত্র দ্বারা মাখনের পরিমাণ স্থির করা যায়। সাধারণতঃ খাঁটি দুধে শতকরা ৩½ হইতে ৪ ভাগ মাখন থাকে। দুগ্ধবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করিলে যদি মাখনের পরিমাণ ইহা অপেক্ষা কম হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, হয় দুধে জল মিশান আছে, নয় ইহার মাখন তুলিয়া লওয়া হইয়াছে।

মাখনে ভেজাল—১। মাখনের প্রধান ভেজাল জল। বিশুদ্ধ মাখনে শতকরা ১৬ ভাগের বেশি জল থাকে না। জল-মিশান মাখনে ইহার দ্বিগুণ পরিমাণ জলও থাকিতে দেখা যায়।

২। মাখন প্রস্তুত করিবার সময় কিছু দধি ইহার সহিত মিশ্রিত থাকিয়া যায়। দধির ভাগ বেশি থাকিলে মাখন শীঘ্র শীঘ্র নষ্ট হইয়া যায়।

৩। অনেক সময় মাখনের সহিত চর্বি মিশান হইয়া থাকে।

৪। মাখনের সহিত কলা, কচু প্রভৃতি সিদ্ধ করিয়া চটকাইয়া মিশান হয় বলিয়াও শুনা যায়।

মাখন জ্বাল দিয়া ঘৃত প্রস্তুত করিলে যদি ঘৃতের পরিমাণ কম হয় এবং নীচে বেশী তলানি না পড়ে, তবে বুঝিতে হইবে উহাতে জল মিশান আছে। মাখনের সহিত দধি মিশ্রিত থাকিলে দধির ছানার অংশ ঘৃতের নীচে তলানি পড়ে ; কিন্তু যদি চর্বি মিশান থাকে, তবে ঘৃতের পরিমাণও কম হইবে না, তলানিও পড়িবে না।

ঘৃতে ভেজাল—১। সাধারণতঃ ঘৃতের সহিত নারিকেল-তৈল, চীনাবাদামের তৈল, মহুয়ার তৈল, পোস্তবীজের তৈল প্রভৃতি মিশান থাকে।

২। অনেক সময় ঘৃতের সহিত নানাবিধ জন্তুর চর্বি মিশ্রিত করা হয়।

৩। গব্য ঘৃতের সহিত মহিষ-দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত ঘৃত মিশান হয়। মহিষ দুগ্ধ হইতে প্রস্তুত ঘৃতের রং অপেক্ষাকৃত সাদা বলিয়া উহার সহিত হলুদ, জাফ্রান প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়।

৪। আজকাল ভেজিটেব্‌ল নামক এক প্রকার উদ্ভিজ্জ পদার্থ বাজারে পাওয়া যায়। দামে সস্তা বলিয়া ব্যবসায়ীরা ইহা ঘৃতের সহিত মিশায়।

গব্য ঘৃতের একটা সুগন্ধ আছে। ঘৃতে বেশী ভেজাল থাকিলে অনেক সময় গন্ধ দ্বারাই উহা টের পাওয়া যায়। ঘৃতের সহিত বেশী তৈল মিশ্রিত থাকিলে ইহাতে দানার পরিমাণ কমিয়া যায় এবং তৈল উপরে ভাসিতে থাকে। বেশী চর্বি মিশ্রিত থাকিলে ঘৃত সহজেই জমাট বাঁধিয়া যায়। ঘৃতে অল্প ভেজাল থাকিলে তাহা রাসায়নিক পরীক্ষা ছাড়া ধরা যায় না।

সরিষার তৈলে ভেজাল—আজকাল সরিষার তৈলেই সর্বাপেক্ষা বেশি ভেজাল চলিতেছে। পল্লীগ্রামে যে ঘানির তৈল পাওয়া যায়, তাহা অপেক্ষাকৃত খাঁটি কিন্তু অধিকাংশ কলের তৈলেই কম-বেশি ভেজাল থাকে। বাংলাদেশে ধনী-দরিদ্র সকলেই রন্ধনকার্যে সরিষার তৈল ব্যবহার করে। **ভেজাল তৈল ব্যবহারই বাঙালী জাতির স্বাস্থ্যহীনতার একটি প্রধান কারণ।**

সরিষার তৈল নিম্নলিখিত প্রকারে ভেজাল দেওয়া হইয়া থাকে:—

১। সাধারণতঃ সরিষার সহিত মাদ্রাজী বাদাম, পোস্তবীজ, সস্তা দরের তিল, তারাবীজ, মহুয়ার বীজ প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া কলে তৈল প্রস্তুত করা হয়।

২। কখন কখন সরিষার তৈলের সহিত রেড়ির তৈল ও এক প্রকার মেটে তৈল মিশান হয়।

৩। ভেজাল তৈলকে খাঁটি সরিষার তৈলের মত ঝাঁজালো করিবার জন্য সরিষা ও অন্যান্য মিশ্রিত দ্রব্যের সহিত এক প্রকার এসিড মিশ্রিত করা হয়।

৪। কখন কখন কলুরা খাঁটি ঘানির তৈলের সহিত কলের ভেজাল তৈল মিশাইয়া উহা খাঁটি ঘানির তৈল বলিয়া বিক্রয় করে।

ময়দা ও আটাতে ভেজাল—সাধারণতঃ গমের দর বাড়িয়া গেলে ময়দা ও আটাতে ভেজাল দেওয়া হইয়া থাকে।

১। সময় সময় ময়দা ও আটার সহিত সস্তা চাউল, জই ও জনারের গুঁড়া মিশান হয়।

২। কলের ময়দার সহিত এক প্রকার ঘাসের বীজ ও খড়ির গুঁড়া মিশান থাকে বলিয়া শুনা যায়।

চাউলে ভেজাল—অসাধু ব্যবসায়ীরা বেশী দামের চাউলের সহিত কম দামের নিকৃষ্ট চাউল মিশাইয়া বিক্রয় করে। অনেক সময় পুরাতন চাউলের সঙ্গে নূতন চাউল মিশ্রিত করিয়া উহা পুরাতন চাউল বলিয়াও বিক্রয় করা হয়।

চিনিতে ভেজাল—আজকাল চিনিতে অল্পাধিক ভেজাল দেওয়া হইয়া থাকে। অসাধু ব্যবসায়ীরা ইহার সঙ্গে আটা, ময়দা প্রভৃতি মিশ্রিত করে।

চায়ে ভেজাল—১। চায়ের যে পাতা একবার ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা শুকাইয়া চায়ের সঙ্গে মিশান হইয়া থাকে।

২। অনেক সময় অন্যান্য বাজে গাছের শুখনা পাতা চায়ের সঙ্গে মিশান থাকে।

অনুশীলনী

১। সাধারণতঃ কোন্ কোন্ খাদ্যে বেশি ভেজাল থাকে ?

২। দুগ্ধে কি কি প্রকার ভেজাল দেওয়া হয় ? ভেজাল ধরিবার উপায় কি ?

৩। মাখন ও ঘৃতে কি কি ভেজাল দেওয়া হয় ? ভেজাল ধরিবার উপায় কি ?

৪। সরিষার তৈলে কি কি ভেজাল দেওয়া হয় ?

সপ্তম অধ্যায়

কুখাদ্য ভোজনের অপকারিতা

শরীরের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধিসাধন এবং কার্যকরী শক্তিলাভের উদ্দেশ্যেই আমরা আহার করিয়া থাকি। খাদ্য যদি উৎকৃষ্ট হয়, তবে তাহা হইতে এই সমস্ত গুণ পাওয়া যায়। কিন্তু খাদ্য নিকৃষ্ট হইলে উহা দ্বারা শরীরের কোন উপকার ত' হয়ই না বরং অপকার ঘটে। **যে খাদ্য সহজে পরিপাকপ্রাপ্ত হয়, যাহা হইতে কোন রোগ উৎপন্ন হয় না, যাহা দ্বারা শরীরের পুষ্টি ও বৃদ্ধিসাধন হয়, তাহাই সুখাদ্য।** যে খাদ্যের দ্বারা এ সমস্ত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, তাহাকে **কুখাদ্য** বলা যায়।

কুখাদ্য ভোজনের বিপদ অনেক। নিকৃষ্ট খাদ্য হইতে অধিকাংশ রোগে সৃষ্টি হয়। নিকৃষ্ট খাদ্য আহার করিলে উহার সমুদয় অংশ পরিপাক প্রাপ্ত হয় না। উহাকে জীর্ণ করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া পরিপাক-যন্ত্রকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়। পুনঃপুনঃ নিকৃষ্ট খাদ্য আহার করিলে পরিপাক-যন্ত্র দুর্বল ও অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। নিকৃষ্ট দুষ্পাচ্য খাদ্যের যে অংশ পরিপাকপ্রাপ্ত হয় না, তাহা বাহির করিয়া দিবার জন্য শরীরের দূষিত পদার্থ নির্গমনের যন্ত্রসমূহকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হয়। এই কঠোর পরিশ্রমে শরীরের বিভিন্ন যন্ত্র দুর্বল ও অকর্মণ্য হইয়া পড়ে। দীর্ঘকাল এরূপ নিকৃষ্ট খাদ্য গ্রহণ করিলে পরিণামে অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, উদরাময় প্রভৃতি রোগ জন্মে।

নিকৃষ্ট খাদ্যের অপরিপক্ব অংশ অনেক সময় বাহির না হইয়া শরীরের ভিতরে পচিয়া নানাবিধ রোগ উৎপন্ন করে। মনে কর, তুমি কতকগুলি পচা মাছ খাইলে। পচা মাছ যে টাটকা মাছ অপেক্ষা দুষ্পাচ্য, তাহা বোধ হয় তোমাদিগকে বলিয়া দিতে হইবে না। এই পচা মাছ জীর্ণ করিতে পরিপাক-যন্ত্রকে যথেষ্ট পরিশ্রম করিতে হইবে; কিন্তু তাহাতেও উহার সমস্ত অংশ জীর্ণ হইবে না। খাদ্য জীর্ণ না হইলে উহার সারাংশ শরীরে গৃহীত হইতে পারে না। সুতরাং এই পচা মাছের অতি সামান্য অংশই শরীরের কাজে লাগিবে। আর এই পচা মাছের যে অংশ হজম হইবে না, তাহা মলমূত্ররূপে বাহির করিয়া দিবার জন্য শরীরের যন্ত্রসমূহকে অতিরিক্ত খাটিতে হইবে। এই অতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলে তোমার পরিপাক-যন্ত্র ও শরীরের অন্যান্য যন্ত্র দুর্বল হইয়া পড়িবে। যদি এই অপরিপক্ব অংশ শরীর হইতে বাহির হইয়া যায়, তবে মন্দের ভাল; কিন্তু বাহির না হইলে উহা শরীরের মধ্যে পচিয়া নানাবিধ দূষিত পদার্থ উৎপন্ন করিবে। এই সমস্ত দূষিত পদার্থ রক্তের সহিত মিশিয়া রক্ত দূষিত করিয়া নানাবিধ রোগের সৃষ্টি করিবে।

আমাদের খাদ্য কিরূপে দূষিত হয় এবং এই দূষিত খাদ্য আহার করিলে আমদের কি কি অপকার হয়, সে সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হইল :—

১। যে সমস্ত দ্রব্যের দ্বারা খাদ্য প্রস্তুত হয়, তাহা নিকৃষ্ট হইলে খাদ্য নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে। মাছ ও মাংস অতি সারবান্ ও পুষ্টিকর খাদ্য। কিন্তু পচিয়া গেলে মাছ-মাংস দুষ্পাচ্য হইয়া

পড়ে এবং ইহাতে নানা প্রকার দূষিত পদার্থ উৎপন্ন হয়। এই সমস্ত দূষিত দ্রব্য দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ করিলে নানাবিধ রোগের সৃষ্টি হয়।

২। খাদ্যে ভেজাল থাকিলে উহা নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে। দুগ্ধ একটি উপাদেয় ও পুষ্টিকর খাদ্য। কিন্তু যদি তাহাতে পচা ডোবা বা পুকুরের দূষিত জল মিশান থাকে, তাহা হইলে উহা দ্বারা শরীরের উপকার না হইয়া অপকারই হইয়া থাকে। দূষিত জল দ্বারা কলেরা, টাইফয়েড, রক্তামাশয় প্রভৃতি রোগের বিস্তার ঘটে। সুতরাং এইরূপ দূষিত দুগ্ধ পান করার ফলে নানাবিধ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মাছ-মাংস শরীরের পক্ষে খুব উপকারী। কিন্তু ভেজাল তৈল দ্বারা রন্ধন করিলে উহা নিকৃষ্ট খাদ্যে পরিণত হয়। নিমন্ত্রণ বাড়ীতে ভেজাল তৈলের রান্না খাইয়া একসংগে বহু লোককে অসুস্থ হইয়া পড়িতে দেখা গিয়াছে।

৩। অনেক সময় উৎকৃষ্ট খাদ্যও প্রস্তুত করিবার দোষে নিকৃষ্ট হইয়া পড়ে। কোন প্রকার খাদ্যই উত্তমরূপে সিদ্ধ না হইলে পরিপাকপ্রাপ্ত হয় না। অর্দ্ধসিদ্ধ চাউল বা ভাত খাইলে পেটফাঁপা, অজীর্ণ, উদরাময় প্রভৃতি রোগ জন্মে। বেশী তৈল ঘৃত ও মসলা সংযোগে রন্ধন করিলে লঘুপাক খাদ্যও গুরুপাক হইয়া যায়। গুরুপাক খাদ্য সহজে হজম হয় না।

৪। অনেক সময় খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুত হইবার পর দূষিত হইয়া থাকে। ডাইল, ভাত, তরকারি প্রভৃতি রান্নার অল্প পরেই উষ্ণ থাকিতে থাকিতে খাওয়া উচিত। খাবার জিনিষ ঠাণ্ডা হইয়া

গেলে উহা সহজে পরিপাকপ্রাপ্ত হয় না। খাদ্যদ্রব্য রান্না করিয়া বেশীক্ষণ রাখিয়া দিলে উহা পচিতে আরম্ভ করে এবং উহাতে একপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ উৎপন্ন হয়। ভাত, ডাইল বা তরকারি পচিতে আরম্ভ করিলেই অম্লস্বাদ হইতে থাকে। সামান্য পচিলে এই অম্লস্বাদ সহজে ধরা পড়ে না; কিন্তু বেশী পচিলে উহার অম্লস্বাদ সহজে ধরা পড়ে। গ্রীষ্মকালে এক বেলার ডাইল বা তরকারি অন্য বেলায় খাইলে এই অম্লস্বাদ বেশ টের পাওয়া যায়। এজন্য একদিনের রান্না খাবার জিনিস পরের দিন বা এক বেলার রান্না জিনিস অন্য বেলায় খাওয়া কখনও উচিত নয়।

৫। অনেক সময় আমাদের অসাবধানতার দোষে রন্ধনের সময় বা রন্ধনের পরে খাদ্যদ্রব্য দূষিত হইয়া পড়ে। রান্নার বাসনপত্র ও রান্নাঘর অপরিষ্কৃত থাকিলে খাদ্য দূষিত হইয়া পড়ে। যে রান্নাকরে, তাহার শরীর ও কাপড়-চোপড় নোংরা থাকিলে খাদ্যদ্রব্য দূষিত হইয়া পড়ে। বাজারের খাবারের দোকানে যাহারা খাবার প্রস্তুত করে, তাহাদের শরীর ও কাপড়-চোপড় প্রায়ই নোংরা থাকে। গরমের দিনে ইহাদের শরীরের ঘাম খাবার জিনিসে পড়িয়া উহা দূষিত করে। তাহা ছাড়া, ইহারা হাত দিয়া ঘাম মুছিয়া হাত না ধুইয়াই খাবার জিনিসে হাত দেয়। এজন্য বাজারের খাবার কখনও খাইতে নাই।

রান্নার পর খাবার জিনিস ঢাকিয়া না রাখিলে উহা মাছি, নানা প্রকার কীটপতঙ্গ ও বায়ুস্থিত ধূলিকণা দ্বারা দূষিত হয়। মাছি কলেরা, রক্তামাশয়, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের জীবাণু পায়ে ও গায়ে করিয়া আনে। ইহারা খাবার জিনিসে বসিলে

ঐ সমস্ত রোগের জীবাণু খাদ্যদ্রব্যে লাগিয়া যায়। এইরূপ দূষিত খাদ্য আহার করিলে ঐ সমস্ত রোগ জন্মে। মাছি বারংবার বমি ও মলত্যাগ করিয়াও খাদ্যদ্রব্য দূষিত করিয়া ফেলে। বাতাসে ধূলিকণার সহিত বসন্ত, যক্ষ্মা প্রভৃতি নানাবিধ রোগের জীবাণু ভাসিয়া বেড়ায়। খাদ্যদ্রব্য ঢাকা না থাকিলে উহা জীবাণু দ্বারা দূষিত হইয়া পড়ে। বাজারের খাবারের দোকানে খাবার জিনিস অনেক সময়ই অনাবৃত অবস্থায় থাকে। সুতরাং **বাজারের খাবার বিষের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে।**

অনুশীলনী

১। কুখাদ্য ভোজনের অপকারিতা কি ?

২। আমাদের খাদ্য দ্রব্য কি কি কারণে দূষিত হয় ?

৩। বাজারের খাবারের দোষ কি ?

———

অষ্টম অধ্যায়

উপকারী ও অপকারী পানীয়

জল—বিশুদ্ধ জলের ন্যায় উৎকৃষ্ট পানীয় আর নাই। পূর্বেই বলা হইয়াছে, শরীররক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ জল পান করা নিতান্ত আবশ্যক। প্রত্যহ আমাদের দুই হইতে তিন সের পর্যন্ত জল পান করা আবশ্যক। আমরা ফলের রস ও চিনি দিয়া যে সমস্ত শরবত প্রস্তুত করি, তাহাদের প্রধান উপাদান জল। তৃষ্ণা পাইলে শীতল জল পান করিয়া যেরূপ তৃপ্তি পাওয়া যায়, অন্য কোন পানীয় দ্বারা সেরূপ পাওয়া যায় না। কিন্তু জল সর্বদাই বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। জলের দ্বারা কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ বিস্তৃত হয়। এজন্য দূষিত জল পান করার ফলে এই সমস্ত সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব হয়। সুতরাং পানীয় জল যাহাতে বিশুদ্ধ হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক। সাধারণতঃ গভীর কূপ ও নলকূপের জল অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ। জল ভালরূপে ফুটাইয়া লইয়া তাহা শীতল হইলে সেই জল পান করা খুব নিরাপদ।

শরবত—জলের সহিত নানাবিধ ফলের রস ও চিনি বা মিছরি মিশাইয়া শরবত প্রস্তুত করা হয়। ইহাতে খাদ্য ও পানীয় উভয় উদ্দেশ্যই সাধিত হয়। লেবু, বেল, আনারস ও তরমুজ প্রভৃতি ফলের রস দিয়া বাড়ীতে যে শরবত প্রস্তুত করা হয়, তাহাতে শরীর ঠাণ্ডা হয় এবং রক্ত পরিষ্কার থাকে। বাজারে

যে ফলের সিরাপ পাওয়া যায়, তাহা প্রায়ই কৃত্রিম। উহাতে ফলের রস মোটেই থাকে না। নানাবিধ কৃত্রিম গন্ধদ্রব্য দ্বারা ঐ সমস্ত সিরাপে ফলের গন্ধ করা হয়। এজন্য ইহাদের বিশেষ কোন উপকারিতা নাই। এই সমস্ত সিরাপ বেশী ব্যবহার করিলে অজীর্ণ, ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি রোগ জন্মে।

শরবতের সঙ্গে বেশী পরিমাণে বরফ ব্যবহার করা উচিত নয়। ইহাতে পরিপাক-ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে।

ডাবের জল—ডাবের জল অতি উৎকৃষ্ট পানীয়। নানা কারণে নদী, কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতির জল দূষিত হইয়া থাকে কিন্তু ডাবের জল সহজে দূষিত হইতে পারে না। কচি ডাবের জল রোগীর পথ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ডাবের জলে পাকস্থলীর ক্রিয়া ভাল থাকে। ইহা পাকস্থলীকে ঠাণ্ডা রাখে এবং বমি ও হিক্কা দমন করে। গ্রীষ্মকালে ডাবের জল অতি উপাদেয় পানীয়। ইহা এত নির্দোষ যে, রাস্তাঘাটে বিশুদ্ধ পানীয় জলের অভাবে ইহা নির্ভয়ে পান করা যায়। ডাবের মুখ কাটিয়া বেশীক্ষণ রাখিয়া দিলে উহা তেমন নির্দোষ ও শীতল থাকে না।

ঘোল—ঘোল অতি উপাদেয় পানীয়। শুধু ঘোল বা ঘোলের শরবত খুব মুখরোচক পানীয়। অনেক সময় ইহা রোগীর পথ্যরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা পাকস্থলীকে ঠাণ্ডা রাখে এবং অন্ত্রস্থিত অনিষ্টকারী জীবাণু নষ্ট করে।

লিমনেড ও সোডা ওয়াটার—আজকাল ছোট বড় সকল শহরেই লেমনেড ও সোডা ওয়াটারের প্রচলন খুব বেশি। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য এসব পানীয়ের তেমন কোন প্রয়োজন নাই।

তবে অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিলে অজীর্ণ, পেটফাঁপা প্রভৃতির উপশম হইয়া থাকে। যে জল দ্বারা এসব প্রস্তুত হয়, তাহা অনেক সময় রোগের জীবাণু দ্বারা দূষিত থাকে। এজন্য এগুলি বেশী ব্যবহার না করাই ভাল।

চা, কফি ও কোকো—স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য ইহাদের কোনও প্রয়োজন নাই। ইহাদের মধ্যে চায়ের প্রচলনই খুব বেশি। অল্প পরিমাণে চা পান করিলে শরীরের বিশেষ কোন অপকার হয় না বরং পরিশ্রমের পর চা পান করিলে শরীরের ক্লান্তি ও অবসাদ কতক পরিমাণে দূর হয়। চায়ে ক্যাফিন ও ট্যানিন নামে দুইটি পদার্থ আছে। ক্যাফিন বেশী পরিমাণে গ্রহণ করিলে বিষের কাজ করে। এইজন্য অধিক পরিমাণে চা পান করিলে অনেক সময় মাথাঘোরা, অনিদ্রা, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়। চা বেশী কড়া হইলে উহাতে যে তিক্তস্বাদ হয়, তাহা ট্যানিনের জন্য। চায়ের সহিত বেশী পরিমাণে ট্যানিন গ্রহণ করিলে পরিপাক-ক্রিয়ার বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে। এজন্য চা প্রস্তুত করিবার সময় চায়ের পাতা অধিকক্ষণ ভিজাইয়া রাখা উচিত নয়। চায়ে যে সামান্য দুধ চিনি থাকে তাহা ছাড়া অন্য কোন উপকারী পদার্থ উহাতে নাই।

কফি একপ্রকার ফলের বীজের গুঁড়া। ইহাতেও ক্যাফিন ও ট্যানিন আছে। এজন্য ইহাও চায়ের মত অপকারী। কোকো চা ও কফির মত উত্তেজক নহে।

মদ্য—মদ্য একটি মাদক দ্রব্য। শীতপ্রধান দেশে ইহা পানীয়রূপে ব্যবহৃত হয়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ইহার কোন

আবশ্যকতা নাই। দীর্ঘকাল মদ্যপান করিলে শরীরের ভিতরের যন্ত্রসমূহ বিকৃত হইয়া যায়। ইহা মস্তিষ্কের অবসাদ ঘটাইয়া বোধশক্তি কমাইয়া দেয়। বেশী পরিমাণে মদ্যপান করিলে মানুষ মাতাল হইয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করে। পূর্বে আমাদের দেশে মদ্যের ব্যবহার খুব বেশি ছিল। কিন্তু সুখের বিষয় অজকাল ইহার ব্যবহার খুব কমিয়া গিয়াছে।

অনুশীলনী

১। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ পানীয় কি ?

২। ডাবের জল ও ঘোলের উপকারিতা কি ?

৩। চা-পানের অপকারিতা কি ?

৪। শরবতের সহিত বেশী পরিমাণে বরফ ব্যবহার করার দোষ কি ? ফলের সিরাপ অপেক্ষা গৃহে প্রস্তুত টাটকা ফলের শরবত বেশী উপকারী কেন ?

দ্বিতীয় খণ্ড

ষষ্ঠ শ্রেণী

প্রথম অধ্যায়

রোগের সংক্রমণ

সংক্রামক রোগ—যে সকল রোগ এক ব্যক্তির শরীর হইতে অন্য ব্যক্তির শরীরে গমন করে, তাহাদিগকে **সংক্রামক** রোগ বলে। কলেরা, বসন্ত, প্লেগ, যক্ষ্মা, টাইফয়েড, আমাশয়, ডিপ্‌থিরিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, হাম, দাদ, পাঁচড়া প্রভৃতি সংক্রামক রোগ।

সাধারণতঃ জল, বায়ু, খাদ্য ও রোগীর স্পর্শ দ্বারা এক ব্যক্তির দেহ হইতে অন্য ব্যক্তির দেহে রোগ সংক্রমিত হয়। দাদ, পাঁচড়া প্রভৃতি কতকগুলি রোগ কেবল স্পর্শ দ্বারা সংক্রমিত হয়; ইহাদিগকে **স্পর্শাক্রামক** (Contagious) রোগ বলে। বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি কতকগুলি রোগ রোগী বা রোগীর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি স্পর্শ দ্বারাও সংক্রমিত হয় আবার অন্য উপায়েও সংক্রমিত হয়। সুতরাং এই সমস্ত রোগ সংক্রামক ও স্পর্শাক্রামক দুই-ই। এজন্য স্পর্শাক্রামক রোগ বুঝাইতেও 'সংক্রামক' শব্দই সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মোটের উপর, সুস্থ ব্যক্তির শরীরে যে কোন উপায়ে রোগের জীবাণু প্রবেশ করিলে যে রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই সংক্রামক রোগ বলে।

তোমরা দেখিয়াছ, যখন পল্লীগ্রামে ম্যালেরিয়া-জ্বর দেখা দেয় তখন একজন দুইজন করিয়া অতি অল্পকালের মধ্যে বহু লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়ে। সময় সময় এরূপ অবস্থা হয় যে, কোন কোন বাড়ীতে ঔষধ ও পথ্য দিবার লোক পর্যন্ত থাকে না। গ্রামে একজনের কলেরা বা বসন্ত হইলে কয়েক দিনের মধ্যে গ্রামের বহু লোকের ভিতর ঐ রোগ বিস্তৃত হইয়া পড়িতে দেখা যায়। ইহার কারণ এই যে, ঐ রোগগুলি সংক্রামক।

সকল সংক্রামক রোগ সমান ভাবে বিস্তৃত হয় না। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগ যত শীঘ্র এবং যত বেশী লোকের মধ্যে বিস্তৃত হয়, দাদ, পাঁচড়া প্রভৃতি রোগ তত শীঘ্র এবং তত বেশী লোকের মধ্যে বিস্তৃত হয় না। ইহাতে বুঝা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন রোগের সংক্রমণের ভিন্ন ভিন্ন উপায় আছে। কাহারও সংক্রামক রোগ হইলে তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যেমন আবশ্যক, বাড়ীর, পাড়ার বা গ্রামের অন্যান্য লোক যাহাতে ঐ রোগে আক্রান্ত না হয়, তজ্জন্য রোগের সংক্রমণের পথ বন্ধ করাও তেমনই আবশ্যক। কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক রোগ গ্রামে দেখা দিলেই ইহার বিস্তার নিবারণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করা আবশ্যক, নতুবা বহু লোকের প্রাণনাশের সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং কি উপায়ে সংক্রামক রোগের বীজ অসুস্থ ব্যক্তির দেহ হইতে সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে এবং কি ভাবে উহার বিস্তার নিবারণ করা যায়, তাহা জানিয়া রাখা সকলের কর্তব্য।

সংক্রামক রোগের জীবাণু—সংক্রামক রোগ মাত্রই এক প্রকার জীবাণু হইতে উৎপন্ন হয়। এই জীবাণুগুলি এক

প্রকার অতি ক্ষুদ্র জীব বা জীবন্ত উদ্ভিদ্। জীবের ন্যায় ইহাদেরও জীবন আছে এবং ইহাদের আকৃতি অণুর মত ক্ষুদ্র বলিয়াই ইহাদিগকে জীবাণু বলে। ইহারা এত ক্ষুদ্র যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত খালি চোখে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় না।



কলেরার জীবাণু



যক্ষার জীবাণু



টাইফয়েড রোগের জীবাণু

৬০টি কলেরা রোগের জীবাণু পাশাপাশি রাখিলে একটি চুলের মত মোটা রেখা হয়। পঁচিশ হাজার কলেরা রোগের জীবাণু পাশাপাশি সাজাইলে উহার দৈর্ঘ্য আধ ইঞ্চিও হয় না। বিভিন্ন সংক্রামক রোগের জীবাণুর আকৃতি বিভিন্ন প্রকার। কোনটি গোল, কোনটি ডিম্বাকৃতি, কোনটি সোজা, আবার কোনটি বা

বক্র। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে হাজার গুণ বড় করিয়া দেখিলে এই সব জীবাণুর কিরূপ দেখায় চিত্রে তাহা লক্ষ্য কর।

পূর্ব পৃষ্ঠার চিত্রের দিকে লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারিবে, সকল সংক্রামক রোগের জীবাণুর আকৃতি এক প্রকার নহে। টাইফয়েড ও কলেরার জীবাণুর গায়ে লেজের মত একটি অংশ আছে কিন্তু যক্ষ্মা-রোগের জীবাণুতে তাহা নাই। কলেরার জীবাণু দেখিতে কমা চিহ্নের (,) ন্যায় বলিয়া ইহাকে **কমা ব্যাসিলাস** বলে।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় জীবাণুদেরও জীবনীশক্তি আছে। ইহারা জলে, স্থলে, আকাশে সর্বত্রই থাকিতে পারে। তবে খোলা জায়গায় ও যেখানে অবাধে সূর্য কিরণ পড়ে, সেখানে কোন জীবাণুই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। যে সব স্থানে অনেক মানুষ বা জীবজন্তু থাকে, সেখানেই রোগের জীবাণুর সংখ্যা বেশি। অন্ধকার ও সেঁতসেঁতে জায়গায় ইহারা দীর্ঘকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে। আলোক ও উত্তাপ ইহাদের পরম শত্রু। বেশীক্ষণ সূর্যকিরণে রাখিলে অধিকাংশ জীবাণুই মরিয়া যায়। **যে জলে জীবাণু আছে, তাহা বিশ মিনিট কাল ফুটাইলে অধিকাংশ জীবাণু মরিয়া যায়।** অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় জীবনধারণের জন্য জীবাণুদেরও খাদ্যের প্রয়োজন। মানুষের সকল প্রকার খাদ্যই ইহারা খাইতে ভালবাসে। ইহারা যাহার দেহ আশ্রয় করে, তাহার দেহের সার পদার্থ খাইয়া জীবনধারণ করে। মানুষের রক্ত, মাংস, অস্থি প্রভৃতি ইহাদের প্রিয় খাদ্য। এইজন্যই ইহারা সর্বদা মানুষের দেহে প্রবেশের চেষ্টা করে।

মানবদেহে জীবাণুর কার্য—জীবাণুগুলি আকারে নিতান্ত ক্ষুদ্র হইলেও ইহাদের ক্ষমতা অসাধারণ। একবার মানুষের দেহে প্রবেশ করিলে এবং সেখানে অনুকূল ক্ষেত্র পাইলে ইহাদের অতিদ্রুত বংশবৃদ্ধি হইতে থাকে। প্রায় আধ ঘণ্টার পর একটি জীবাণু দেহ বিভক্ত হইয়া দুইটি হইয়া যায়। এইরূপে দুইটি হইতে চারিটি, চারিটি হইতে আটটি হয় এবং এইরূপে লক্ষ লক্ষ নূতন জীবাণুর সৃষ্টি হয়। অনুকূল অবস্থা পাইলে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে একটি জীবাণু হইতে প্রায় দুই কোটি জীবাণুর সৃষ্টি হইতে পারে। এই সকল জীবাণু মানুষের দেহের সারাংশ ভক্ষণ করে এবং তাহাদের দেহ হইতে একপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ ত্যাগ করে। এই বিষাক্ত পদার্থ শরীরের জীব-কোষের অনিষ্টসাধন করিয়া নানা প্রকার উপসর্গের সৃষ্টি করে। যতদিন পর্যন্ত এই বিষের পরিমাণ আমাদের দেহের পক্ষে যথেষ্ট না হয়, ততদিন আমাদের দেহে রোগের লক্ষণ দেখা যায় না। দেহে জীবাণু প্রবেশের সময় হইতে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত সময়কে ঐ **রোগের উপ্তাবস্থা** বলে।

অধিকাংশ জীবাণুর আক্রমণের ফলে শরীরের তাপ বাড়িয়া জ্বর দেখা দেয়। এজন্য সর্দি, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের জীবাণুর আক্রমণে জ্বর হইয়া থাকে। প্রায় সকল প্রকার জীবাণুই রোগীর মল, মূত্র, কফ, থুথু, বমি বা ক্ষত-রসের সহিত শরীর হইতে বাহির হইয়া থাকে।

সংক্রামক রোগের বিস্তারের কারণ—সংক্রামক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে অসংখ্য রোগ-জীবাণু থাকে।

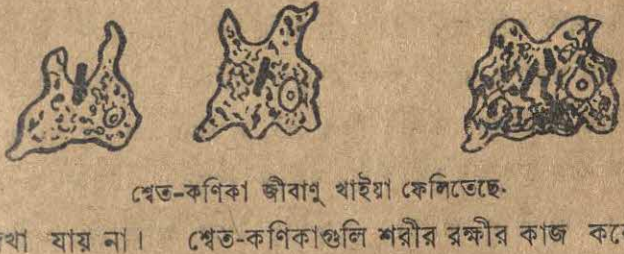
এই সকল জীবাণু অসুস্থ ব্যক্তির দেহ হইতে বহির্গত হইয়া সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে। কাহারও সংক্রামক রোগ হইলে বুঝিতে হইবে যে, রোগের জীবাণু কোন রুগ্ন ব্যক্তি বা পশুর দেহ হইতে আসিয়াছে। কোন কোন সংক্রামক রোগ পশুর দেহ হইতেও মানুষের দেহে সংক্রমিত হয়। ইঁদুর হইতে প্লেগ, গবাদি পশু হইতে যক্ষ্মা, পাগলা কুকুর বা শৃগাল হইতে জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু মানুষের দেহে প্রবেশ করে। হঠাৎ কাহারও কলেরা বা রক্তামাশয় হইলে আমরা মনে করি, দূষিত খাদ্য বা জল হইতেই রোগের উৎপত্তি হইয়াছে। **দূষিত খাদ্য বা জল সংক্রামক ব্যাধির কারণ নহে; জীবাণুই কারণ।** এগুলি রোগের বাহনমাত্র, অর্থাৎ এগুলির ভিতর দিয়া রোগের জীবাণু মানুষের দেহে প্রবেশ করে।

যদি সংক্রামক রোগের জীবাণু পীড়িত ব্যক্তির শরীর হইতে বাহির হইতে না পারিত, তাহা হইলে অন্যের এই রোগের দ্বারা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকিত না। সংক্রামক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীর হইতে মল, মূত্র বমি প্রভৃতির সহিত অসংখ্য রোগ-জীবাণু নির্গত হয়। সুতরাং রোগীর মলমূত্রাদি পোড়াইয়া ফেলা বা মাটিতে পুঁতিয়া ফেলা উচিত। ইহাতে রোগের জীবাণুগুলি নাশপ্রাপ্ত হয় বলিয়া রোগ-সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে না। রোগের জীবাণুসমূহ পীড়িত ব্যক্তির দেহ হইতে বাহির হইয়া জল, বায়ু, খাদ্য ও রোগীর সংস্পর্শ দ্বারা সুস্থ ব্যক্তির শরীরে সংক্রমিত হয়। একটি জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিলে তাহা হইতে অসংখ্য জীবাণুর সৃষ্টি হয়। এইজন্য আমরা রোগে আক্রান্ত হইয়া

থাকি। মানবদেহে প্রবেশের পর যদি জীবাণুর বংশবৃদ্ধি না হইত, তাহা হইলে একটিমাত্র জীবাণুর দ্বারা আমাদের শরীরের বিশেষ কোন অনিষ্ট হইত না।

বায়ু, জল ও খাদ্যের সহিত সর্বদাই নানা প্রকার রোগ-জীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করিতেছে। রোগ-জীবাণু সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করিলেই যে রোগ উৎপন্ন হইবে, তাহার কোন নিশ্চয়তা নাই। কোন স্থানে কলেরার প্রাদুর্ভাব হইলে অনেকে কলেরায় আক্রান্ত হয়, আবার অনেকে হয় না। ইহার কারণ কি? আমাদের শরীরের এমন একটি স্বাভাবিক শক্তি আছে, যাহার জন্য কোন রোগই সহজে আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। ইহাকে **রোগ-প্রতিষেধক শক্তি** বলে।

আমাদের রক্তে রক্ত-কণিকা ও শ্বেত-কণিকা নামক দুই প্রকার কণিকা আছে। এগুলি এত ক্ষুদ্র যে, খালি চোখে



শ্বেত-কণিকা জীবাণু খাইয়া ফেলিতেছে·

দেখা যায় না। শ্বেত-কণিকাগুলি শরীর রক্ষীর কাজ করে। বাহির হইতে শরীরের ভিতরে কোন জীবাণু প্রবেশ করিলেই শ্বেত-কণিকাগুলি ইহার সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দেয়। যদি শ্বেত-কণিকাগুলি জীবাণুকে পরাস্ত করিয়া খাইয়া ফেলিতে পারে তাহা হইলে আর রোগে আমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না।

যদি শ্বেত-কণিকাগুলি পরাস্ত হইয়া যায়, তাহা হইলে জীবাণুগুলি ক্রমশঃ সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইয়া শরীরের রক্ত বিষাক্ত করিয়া ফেলে এবং কয়েক দিনের মধ্যেই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়।

শরীর সবল থাকিলে শ্বেত-কণিকাগুলি শক্তিশালী থাকে বলিয়া ইহারা সংক্রামক রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে পারে। দুর্বল ব্যক্তির শরীরে রোগ-প্রতিষেধক শক্তি খুব কম



জীবাণু কর্তৃক বিনষ্ট শ্বেত-কণিকা

থাকে। এইজন্যই কোনও স্থানে সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে দুর্বল লোকেরাই প্রথমে আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

আমাদের শরীরের যে স্বাভাবিক রোগ-প্রতিষেধক শক্তি আছে, তাহা ছাড়া কৃত্রিম উপায়েও আমরা রোগ-প্রতিষেধক শক্তি লাভ করিতে পারি। যে ব্যক্তি দীর্ঘকাল যাবৎ আফিং খাইতে অভ্যস্ত, একটু বেশী মাত্রায় আফিং খাইলেও তাহার শরীরে বিষক্রিয়া হয় না ; কিন্তু এই পরিমাণ আফিং খাওয়ার ফলে অন্য লোকের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে। ইহার কারণ কি? দীর্ঘকাল আফিং খাওয়ার ফলে আমাদের শরীরে আফিংএর বিষক্রিয়া প্রতিরোধ করিবার একটি শক্তি জন্মে ; একবার বসন্ত হইলে আর সাধারণতঃ বসন্ত হইতে দেখা যায় না। কলেরা, বসন্ত, প্রভৃতি রোগের টীকা লইয়া কিছুকালের জন্য এই সমস্ত রোগের হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

টীকা প্রভৃতির সাহায্যে আমরা যে রোগ-প্রতিষেধক শক্তি লাভ করি, তাহাকে কৃত্রিম রোগ-প্রতিষেধক শক্তি বলা যাইতে পারে।

উপরে যাহা আলোচনা করা হইল, তাহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে, নিম্নলিখিত পাঁচটি কারণে আমরা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকি :—

(১) রোগাক্রান্ত মানুষ বা পশুতে রোগ-জীবাণুর অবস্থান।

(২) পীড়িত ব্যক্তি বা পশুর মল, মূত্র, বমি, থুথু বা ক্ষত-রসের সহিত রোগ-জীবাণুর নির্গমন।

(৩) সুস্থ ব্যক্তির দেহে রোগ-জীবাণুর প্রবেশ।

(৪) মানবদেহে রোগ-জীবাণুর বংশবৃদ্ধি।

(৫) রোগ-প্রতিষেধক শক্তির অভাব।

রোগের লক্ষণ প্রকাশ—রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করা মাত্রই রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় না। জীবাণু দেহে প্রবেশ করিলেই শ্বেত-কণিকাদের সহিত ইহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। শ্বেত-কণিকাগুলি যুদ্ধে পরাস্ত হইলেই জীবাণু সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া রোগ উৎপাদন করিতে পারে। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জীবাণুর বংশবৃদ্ধির জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সময়ের প্রয়োজন হয়। সুতরাং সংক্রামক রোগীর সংস্পর্শে আসার ফলে কাহারও শরীরে রোগের জীবাণু প্রবেশ করিয়াছে সন্দেহ হইলে ঐ রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে যতদিন সময় লাগে, ততদিন পর্যন্ত তাহাকে পৃথগ্‌ভাবে রাখা উচিত।

রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার পর হইতে যতদিন পর্যন্ত জীবাণুগুলি সংখ্যায় ও শক্তিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারে, ততদিন

পর্যন্তই রোগের প্রকোপ চলিয়া থাকে। সংখ্যায় ও শক্তিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জীবাণুর ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সময় লাগে ; কেহ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হইলে একটা নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত তাহার শরীরস্থ জীবাণুর অন্যের দেহে সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। এজন্য রোগমুক্তির পরেই সংক্রামক রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সহিত মেলামেশা করা উচিত নহে। রোগমুক্তির পরও কিছুকাল পর্যন্ত রোগীকে পৃথগ্‌ভাবে রাখা আবশ্যক। শরীরে রোগ-জীবাণু প্রবেশের পর কত দিনে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং কত দিন পর্যন্ত উহা সংক্রামিত হইবার আশঙ্কা থাকে, তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

রোগের নাম	কত দিনে রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়	কত দিন পর্যন্ত সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে
কলেরা	কয়েক ঘণ্টা হইতে ৫ দিন	২ সপ্তাহ
বসন্ত	১২ দিন	৬ সপ্তাহ
টাইফয়েড	৫ হইতে ২০ দিন	৬ সপ্তাহ
হাম	৮ হইতে ১৫ দিন	৪ সপ্তাহ
জল বসন্ত	১০ হইতে ১২ দিন	৩ সপ্তাহ
ইনফ্লুয়েঞ্জা	১ হইতে ৪ দিন	২ সপ্তাহ
ডিপ্‌থিরিয়া	১ হইতে ৮ দিন	৬ সপ্তাহ

শরীরে রোগ-জীবাণুর প্রবেশপথ—সংক্রামক রোগের জীবাণু সাধারণতঃ তিনটি পথ দিয়া মানুষের শরীরে প্রবেশ করে ; যথা :—

(১) **চর্মের ভিতর দিয়া**—দাদ, পাঁচড়া, বিসর্প, বক্র-কীট প্রভৃতি রোগের জীবাণু চর্মের ভিতর দিয়া আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। ম্যালেরিয়া, গোদ, প্লেগ প্রভৃতি রোগের জীবাণু কীট-পতঙ্গাদির দংশনের সহিত চর্মের ভিতর দিয়া আমাদের দেহে সংক্রমিত হয়। শরীরের কোন স্থান কাটিয়া গেলে ধনুষ্টঙ্কার-রোগের জীবাণু ঐ ক্ষতস্থানের ভিতর দিয়া



চর্মের ভিতর দিয়া ম্যালেরিয়ার পরজীবীর প্রবেশ

শরীরে প্রবেশ করে। পাগলা কুকুর বা শিয়ালে কামড়াইলে উহাদের লালার সহিত জলাতঙ্ক রোগের জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে।

(২) **নাসাপথ দিয়া**—সর্দি, নিউমোনিয়া, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, ডিপ্‌থিরিয়া, হাম, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের জীবাণু ধূলিকণার সহিত বায়ুতে ভাসিয়া বেড়ায়। আমরা যে শ্বাসবায়ু গ্রহণ করি, তাহার সহিত এই সমস্ত রোগের জীবাণু আমাদের নাসাপথ দিয়া ফুসফুসে প্রবেশ করে।

(৩) **মুখগহ্বর দিয়া**—রোগের জীবাণু দ্বারা দূষিত জল বা খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিলে কলেরা, রক্তামাশয়, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের জীবাণু আমাদের শরীরে প্রবেশ করে।

কোন্ কোন্ পথ দিয়া রোগ-জীবাণু আমাদের দেহে প্রবেশ করে, তাহা তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ। কি কি উপায়ে এবং কোন্ কোন্ পদার্থের ভিতর দিয়া ইহারা আমাদের শরীরে প্রবেশ করে, তাহা নিম্নে আলোচিত হইল।

রোগ-সংক্রমণের বিভিন্ন উপায়

বায়ু, জল ও খাদ্য ব্যতীত আমরা জীবনধারণ করিতে পারি না। অধিকাংশ সংক্রামক রোগের বীজ এই তিনটি পদার্থের সাহায্যে আমাদের দেহে প্রবেশ করে। কোন কোন সংক্রামক রোগের বীজ এই তিনটি উপায় ব্যতীত অন্য উপায়েও মানুষের শরীরে প্রবেশ করে। যেমন, খোস, পাঁচড়া, দাদ প্রভৃতির বীজ চর্মের ভিতর দিয়া প্রবেশ করে। মশায় কামড়াইলে মশার শরীর হইতে ম্যালেরিয়ার বীজ মানবদেহে প্রবেশ করে। যে সমস্ত রোগের বীজ জল, বায়ু ও খাদ্যদ্রব্যের সাহায্যে মানবদেহে প্রবেশ করে সেগুলির বিষয়ে এখানে আলোচনা করা হইল।

সাধারণতঃ নিম্নলিখিত পাঁচটি উপায়ে সংক্রামক রোগ অসুস্থ ব্যক্তির দেহ হইতে সুস্থ ব্যক্তির দেহে সংক্রমিত হইয়া থাকে ; যথা :—

১। **রোগী সংস্পর্শ দ্বারা।**

২। **ধূলাবালি দ্বারা।**

৩। মাছির দ্বারা।

৪। জল দ্বারা।

৫। দূষিত তরল পদার্থ দ্বারা।

১। রোগীর সংস্পর্শ দ্বারা রোগের সংক্রমণ— কতকগুলি সংক্রামক রোগের বীজ রোগীর সংস্পর্শ দ্বারা পীড়িত ব্যক্তির দেহ হইতে সুস্থ ব্যক্তির দেহে সংক্রমিত হইয়া থাকে। অধিকাংশ চর্মরোগ স্পর্শ দ্বারা সংক্রমিত হয়। খোস, পাঁচড়া, দাদ, বিসর্প প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির পীড়িত স্থান স্পর্শ করিলে এই সমস্ত রোগ সংক্রমিত হইয়া থাকে। রুগ্ন ব্যক্তির ব্যবহৃত জামা, কাপড়, গামছা, বিছানা প্রভৃতিতে ক্ষতস্থানের পুঁজ, রক্ত, রস প্রভৃতি লাগিয়া থাকে। এজন্য রোগীর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ব্যবহার করিলে রোগের বিস্তার হইয়া থাকে। রোগীর মল, মূত্র, বমি প্রভৃতিও রোগের জীবাণু থাকে। এজন্য রোগীর মলমূত্র-মাখা বিছানা বা কাপড়-চোপড় স্পর্শ করিলেও রোগের বিস্তার ঘটিতে পারে। তোমরা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছ, ডাক্তারেরা



পিঠে দাদ

রোগী দেখিয়া সাবান দিয়া হাত ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলেন। রোগীকে স্পর্শ করার ফলে রোগের জীবাণু হাতে লাগিয়া থাকিতে পারে বলিয়াই সাবান দিয়া হাত ধুইয়া ফেলা হয়।

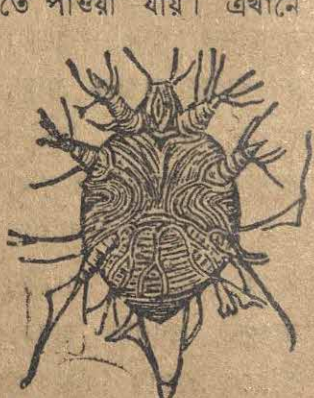


হাতে পাঁচড়া

যে সমস্ত রোগ রোগীর সাক্ষাৎ স্পর্শ বা রোগীর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ব্যবহারের ফলে উৎপন্ন হয়, তাহাদের মধ্যে খোস, পাঁচড়া ও দাদ প্রধান। ইহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কীটাণু হইতে উৎপন্ন হয়। এই কীটাণুগুলি কলেরা প্রভৃতি রোগের জীবাণুর ন্যায় এত ক্ষুদ্র নহে। ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে খালি চোখেও ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে



দাদের পোকা



পাঁচড়ার পোকা

দাদ ও পাঁচড়ার পোকার যে ছবি দেখিতে পাইতেছ, তাহা স্বাভাবিক আকার অপেক্ষা অনেক বড় করিয়া দেখান হইয়াছে।

খোস, পাঁচড়া, দাদ প্রভৃতি রোগ রোগীর সাক্ষাৎ সংস্পর্শ বা তাহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদির সংস্পর্শে হইয়া থাকে বলিয়া ইহাদিগকে স্পর্শাক্রামক রোগও বলা হয়।

২। **ধূলাবালির দ্বারা রোগের সংক্রমণ**—বায়ু ছাড়া আমরা পাঁচ মিনিট কালও বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। বিশুদ্ধ বায়ু আমাদের জীবন রক্ষার প্রধান সহায়।* কিন্তু দূষিত হইলে এই বায়ুই আমাদের প্রাণনাশের কারণ হয়। জোরে বাতাস বহিলে যে সমস্ত ধূলাবালি বাতাসে উড়িয়া আসিয়া আমাদের গায়ে লাগে, তাহা আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই। কিন্তু এই সমস্ত ধূলাবালি ছাড়া সর্বদাই বায়ুতে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধূলি-কণা ভাসিয়া বেড়াইতেছে। ইহারা এত সূক্ষ্ম যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত খালি চোখে ইহাদিগকে দেখা যায় না। তোমরা একটি সহজ উপায়ে বায়ুতে ধূলিকণার অবস্থিতি পরীক্ষা করিতে পার। যখন জানালার মধ্য দিয়া সূর্যরশ্মি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে, তখন লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে, অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ধূলিকণা বায়ুতে ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

আমরা যখন শ্বাস গ্রহণ করি, তখন এই সমস্ত ধূলিকণা বায়ুর সহিত আমাদের নাসিকার মধ্যে প্রবেশ করে। এই সমস্ত ধূলিকণার কতকাংশ নাসিকার মধ্যস্থিত লোম ও চামড়ায় লাগিয়া যায় এবং কতকাংশ বায়ুর সহিত ফুসফুসে প্রবেশ করে। পল্লীগ্রাম অপেক্ষা শহরের বায়ুতে ধূলিকণার পরিমাণ অনেক বেশি। কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় শহরে শীতকালের সকাল বেলায় কাপড় দিয়া নাকের ভিতর মুছিলে কাপড়ে ময়লা

লাগিয়া থাকে। এই ময়লা বায়ুস্থিত ধূলাবালি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

বায়ুতে যে সমস্ত ধূলিকণা মিশ্রিত থাকে, তাহা যে শুধু মাটির কণা তাহা নহে। ইহার সহিত জীবজন্তুর শরীরের লোম ও চর্মের কণা, পাট, তূলা, পশম প্রভৃতির সূক্ষ্ম অংশ, কল-কারখানা হইতে নির্গত ধূম, মনুষ্য ও অন্যান্য জীবজন্তুর থুথু, কাসি, মলমূত্র প্রভৃতির সূক্ষ্ম অংশ মিশ্রিত থাকে। তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ, সংক্রামক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মলমূত্রাদিতে রোগের জীবাণু থাকে। এই সমস্ত মল, মূত্র, বমি, থুথু, কাসি প্রভৃতি যেখানে সেখানে ফেলিলে উহার কতকাংশ শুকাইয়া ধূলাবালির সহিত বায়ুতে মিশিয়া বায়ুকে দূষিত করিয়া ফেলে। আমরা যখন শ্বাস গ্রহণ করি, তখন এই দূষিত বায়ু আমাদের নাসাপথ দিয়া ফুসফুসে প্রবেশ করিয়া নানা প্রকার রোগ উৎপাদন করে। **ধূলিকণা দ্বারা যে সমস্ত রোগ সংক্রামিত হয়, তন্মধ্যে যক্ষ্মা, বসন্ত, হাম, নিউমোনিয়া, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, ডিপ্‌থিরিয়া ও ধনুষ্টঙ্কার প্রধান।** ইহাদের জীবাণুর সংক্রমণের পন্থা ও নিবারণের উপায় সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা হইল :—

যক্ষ্মা—যক্ষ্মা রোগীর শরীর হইতে কাসি, থুথু প্রভৃতির সহিত যক্ষ্মার জীবাণু অসংখ্য পরিমাণে নির্গত হয়। এই সমস্ত কাসি, থুথু প্রভৃতি যেখানে সেখানে ফেলিলে উহা শুকাইয়া ধূলিকণার সহিত বাতাসে উড়িয়া শ্বাসবায়ুর সহিত অন্য লোকের ফুসফুসে প্রবেশ করিয়া রোগ উৎপাদন করে। যক্ষ্মা-রোগী

যখন কাসিতে থাকে, তখন তাহার মুখ হইতে থুথু, কাসি প্রভৃতির কণা বাহির হইয়া নিকটবর্তী সুস্থ লোকের নাকমুখ দিয়া তাহার শরীরে প্রবেশ করিতে পারে। এইরূপে যক্ষ্মা-রোগের বিস্তার হইয়া থাকে।



যক্ষ্মার জীবাণু ও যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগী

যক্ষ্মা রোগের সংক্রামণ নিবারণের জন্য নিম্নলিখিত উপায়-গুলি অবলম্বন করা আবশ্যক ঃ—

(১) রোগীকে একটি পৃথক্ ঘরে রাখিবে। বাড়ীর যে দিক্ হইতে সাধারণতঃ বায়ু প্রবাহিত হয়, তাহার বিপরীত দিকের ঘরে রোগীকে রাখিলে দূষিত বায়ু দ্বারা বাড়ীর অন্যান্য লোকের দেহে রোগ-সংক্রমণের আশঙ্কা কম থাকে।

(২) রোগীর গৃহে যাহাতে অবাধে বায়ু ও সূর্যকিরণ প্রবেশ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(৩) রোগীর ব্যবহৃত কোন জিনিসপত্র ব্যবহার করিবে না।

(৪) রোগীর কাসি, থুথু প্রভৃতি যাহাতে শুকাইয়া বাতাসের সহিত মিশিতে না পারে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। একটি পাত্রে এক শত ভাগ জলের সহিত পাঁচ ভাগ কার্বলিক এসিড মিশাইয়া পাত্রটি রোগীর কাছে রাখিবে। রোগী এই পাত্র ভিন্ন অন্য কোথাও কাসি বা থুথু ফেলিবে না। পরে এই কাসি বা থুথু পোড়াইয়া ফেলিবে।

(৫) কাসিবার সময় ও হাঁচিবার সময় রোগীর নাকে ও মুখের উপর একখণ্ড ন্যাকড়া ধরিয়া রাখিবে এবং পরে সেই ন্যাকড়া পোড়াইয়া ফেলিবে।

বসন্ত—বসন্তের গুটী যখন পাকিয়া শুকাইতে থাকে, তখন উহা হইতে এক প্রকার রেণুবৎ পদার্থ নির্গত হইতে থাকে। এই রেণু বায়ু দ্বারা বাহিত হইয়া আমাদের গায়ে লাগে এবং নাসা-পথ দিয়া আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। বসন্তের গুটীতে যে পুঁজ জন্মে তাহা শরীরে লাগিলেও বসন্ত-রোগ হয়। কেহ কেহ বলেন, নিঃশ্বাসের সহিত বসন্ত-রোগীর শরীর হইতে অসংখ্য জীবাণু নির্গত হইয়া থাকে। বসন্ত অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগ। নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিলে বসন্ত-রোগের বিস্তার অনেক পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে :—

(১) বসন্ত রোগীকে একটি পৃথক ঘরে রাখিতে হইবে। রোগীর ঘর হইতে কোন জিনিষ বাহিরে আনিবে না।

(২) যাহারা টীকা লয় নাই বা বহুদিন পূর্বে টীকা লইয়াছে, তাহারা বসন্ত রোগীর শুশ্রূষা করিবে না।

(৩) বসন্ত রোগীর মল, মূত্র, থুথু, ক্ষত-রস প্রভৃতি শতকরা ১০ ভাগ ফর্মালিনযুক্ত জলপূর্ণ পাত্রে রাখিয়া তৎক্ষণাৎ মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিবে।

(৪) বায়ু ও মাছির দ্বারাই বসন্ত রোগের বিস্তার হয় সুতরাং যাহাতে রোগীর শরীরে মাছি বসিতে না পারে, সেজন্য রোগীকে সর্বদা মশারির ভিতরে রাখিবে।

(৫) ফর্মালিনমিশ্রিত জলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া রোগীর ঘরের দরজা ও জানালায় টানাইয়া রাখিবে এবং যখন রোগীর গায়ের ক্ষত শুকাইয়া আসিতে থাকে, তখন তাহার গায়ে ইউক্যালিপ্টাস-তৈল বা অন্য কোন পচন-নিবারক তৈল মাখাইয়া রাখিলে রোগের জীবাণু দ্বারা বায়ু দূষিত হইতে পারে না।

(৬) বসন্ত রোগ সারিয়া গেলেও যতদিন পর্যন্ত মামড়িগুলি খসিয়া না পড়ে, ততদিন রোগীকে বাহিরে যাইতে দিবে না বা তাহার সহিত মেলামেশা করিবে না।

(৭) বসন্ত রোগী মারা গেলে শতকরা ৪০ ভাগ ফর্মালিন-মিশ্রিত জলে কাপড় ভিজাইয়া সেই কাপড়ে মৃতদেহ জড়াইয়া তাহা তৎক্ষণাৎ পুঁতিয়া বা পোড়াইয়া ফেলিবে।

(৮) বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে অবিলম্বে টীকা লইবে। একবার টীকা লইলে উহার ফল ৫।৬ বৎসরের অধিক কাল থাকে না। সুতরাং পূর্বে টীকা লওয়া থাকিলেও বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইবামাত্র পুনরায় টীকা লইবে।

হাম ও ডিপ্‌থিরিয়া—হাম ও ডিপ্‌থিরিয়া শিশুদেরই বেশী হইয়া থাকে। এ দুইটি রোগ ভয়ানক ছোঁয়াচে। ইহাদের জীবাণু রোগীর নাক ও মুখ দিয়া কফ, কাসি ও থুথুর সহিত বাহির হয়। রোগীর কফ, থুথ প্রভৃতি যেখানে সেখানে ফেলিলে তাহা শুকাইয়া বায়ুতে মিশিয়া সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করে। রোগীকে সম্পূর্ণ পৃথগ্‌ভাবে রাখিলে এবং রোগীর কফ, কাসি বা থুথু যাহাতে শুকাইয়া বায়ুতে মিশিতে না পারে সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করিলে এই সমস্ত রোগের বিস্তার ঘটে না। রোগী আরোগ্যলাভ করিলে রোগীর ব্যবহৃত দ্রব্যাদি বিশোধক দ্রব্যের সাহায্যে শোধিত করিয়া লওয়া আবশ্যক। বাড়ীতে হাম বা ডিপ্‌থিরিয়ার রোগী থাকিলে শিশুদিগকে কখনও রোগীর সংস্পর্শে যাইতে দিবে না।

নিউমোনিয়া ও ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা—এই সকল সংক্রামক রোগের জীবাণু পীড়িত ব্যক্তির কফ, কাসি ও থুথুর সহিত নির্গত হয়। এই সমস্ত দূষিত পদার্থ যেখানে সেখানে ফেলিলে উহা শুকাইয়া ধূলিকণার সহিত মিশিয়া সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করে।

বাড়ীতে নিউমোনিয়া বা ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগ দেখা দিলে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করা উচিত :—

(১) নিউমোনিয়া ও ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগ প্রায়ই শরীরে ঠাণ্ডা লাগিয়া হইয়া থাকে। এজন্য যাহাতে হঠাৎ বাহিরের ঠাণ্ডা বাতাস শরীরে না লাগিতে পারে, সে বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

(২) রোগীর কফ, কাসি ও থুথু একটি নির্দিষ্ট পাত্রে ফেলিবে এবং পরে উহা পোড়াইয়া ফেলিবে।

(৩) রোগী কাশিবার ও হাঁচিবার সময়ে ন্যাকড়া ব্যবহার করিবে।

(৪) রোগীর ব্যবহৃত কাপড়, গামছা, বিছানা বা বাসনপত্র ব্যবহার করিবে না।

(৫) রোগীর ঘরে যাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু চলাচল করিতে পারে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। বাড়ীর অন্যান্য লোকদেরও প্রত্যহ কিছুকাল বাহিরের মুক্ত বায়ু সেবন করা উচিত। ইহাতে এই সমস্ত রোগ প্রতিরোধ করিবার শক্তি বৃদ্ধি পায়।

ধনুষ্টঙ্কার—এই রোগের জীবাণু রাস্তায়, বিশেষতঃ ঘোড়ার আস্তাবলের নিকটের ধূলাবালিতে প্রচুর পরিমাণে থাকে। ধনুষ্টঙ্কারের জীবাণু ধূলাবালির সহিত ক্ষতস্থানের ভিতর দিয়া রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া রোগ উৎপাদন করে। এজন্য কোন স্থান কাটিয়া গেলে তৎক্ষণাৎ সেখানে টিংচার আইওডিন লাগাইয়া দেওয়া উচিত।

৩। **মাছির দ্বারা রোগের সংক্রামণ**—তোমরা বাড়ী-ঘরে প্রত্যহ শত শত মাছি দেখিতে পাও। সাপে বা বাঘে যত লোকের মৃত্যু ঘটায়, মাছি তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী লোকের প্রাণনাশ ঘটাইয়া থাকে। সুতরাং মাছি মানুষের ভীষণ শত্রু। মাছির অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে জানিবার পূর্বে

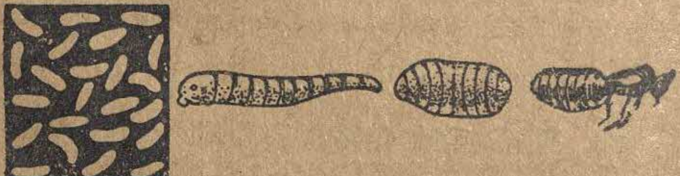
উহার জন্ম ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জানিয়া রাখা আবশ্যক।

মাছির জন্মের চারিটি অবস্থা। এক একটি স্ত্রী-মাছি পচা মল, গোবর, আবর্জনা প্রভৃতিতে একবারে এক শত দেড় শত ডিম পাড়ে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই সমস্ত ডিম হইতে কৃমির ন্যায় সাদা এক প্রকার পোকা জন্মে। ইহারা পচা গোবর প্রভৃতি খাইয়া ক্রমশঃ বড় হয় এবং ইহার মধ্যে হিলিবিলি করিয়া বেড়ায়।



মাছি

ইহাদিগকে **শূককীট** বলে। শূককীট অবস্থায় ইহারা ৪।৫ দিন থাকে। পরে ইহাদের দেহ গুটাইয়া গুটীর আকার ধারণ করে।



মাছির ডিম, শূককীট, মূককীট, মূককীটের দেহ বিদীর্ণ করিয়া মাছির জন্ম

তখন ইহাদিগকে **মূককীট** বলে। এই অবস্থায় ইহারা ৪।৫ দিন থাকে। অবশেষে মূককীটের দেহ বিদীর্ণ করিয়া পূর্ণাঙ্গ

মাছি বাহির হয়। ছবিতে মাছির জন্মের চারিটি অবস্থা লক্ষ্য কর।

মাছি কলেরা, রক্তামাশয়, টাইফয়েড, যক্ষ্মা, বসন্ত প্রভৃতি রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মল, মূত্র, বমি, কাসি, থুথু প্রভৃতিতে বসে। একটু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবে, মাছির পাগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোমে আবৃত। মলমূত্রাদির উপর বসিলে উহার পায়ের লোমে ও ডানায় ময়লা ও তৎসঙ্গে রোগের জীবাণু লাগিয়া যায়। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, একটি মাছি তাহার গায়ে ও পায়ে করিয়া কয়েক লক্ষ রোগ-জীবাণু বহন করিতে পারে। পরে উহারা যখন আমাদের খাদ্যদ্রব্যে আসিয়া বসে, তখন উহাদের শরীর হইতে রোগের জীবাণু খাদ্যদ্রব্যে লাগিয়া যায়। এইরূপ দূষিত খাদ্য আহার করিলে এই সমস্ত রোগ জন্মে। মাছি ঘন ঘন বমি ও বারংবার মলত্যাগ করিয়াও আমাদের খাদ্যদ্রব্য দূষিত করিয়া ফেলে।

মাছি বসন্ত রোগীর পুঁজ গায়ে ও পায়ে করিয়া আনিয়া আমাদের শরীরে ও খাদ্যদ্রব্যে বসে। এইরূপে মাছি দ্বারা বসন্ত রোগের বিস্তার হয়। মাছি যক্ষ্মা রোগীর কাসি, থুথু প্রভৃতি হইতে জীবাণু আনিয়া আমাদের খাবার জিনিসে বসে। এইরূপ দূষিত খাদ্য আহার করিয়া আমরা যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত হই।

এখন বোধ হয় তোমরা বুঝিতে পারিয়াছ, মাছি আমাদের কত বড় শত্রু এবং ইহা কিরূপে আমাদের সহিত শত্রুতাসাধন করে। সুতরাং মাছির হাত হইতে অব্যাহতি পাইতে হইলে, যাহাতে মাছি জন্মিতে না পারে এবং যাহাতে বাড়ীতে মাছির

উপদ্রব না হয়, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা একান্ত আবশ্যক। নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মানিয়া চলিলে মাছির দ্বারা রোগের সংক্রমণ অনেক পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে :—

(১) পচা জিনিসই মাছির প্রিয় খাদ্য এবং পচা জিনিসেই ইহারা ডিম পাড়ে। সুতরাং বাড়ীতে বা বাড়ীর নিকটে কোথাও যাহাতে মল, মূত্র, গোবর, চোনা, আবর্জনা প্রভৃতি



ঢাকা খাবার ও আঢাকা খাবার

না পচে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিলে মাছি জন্মিতে পারে না। এই সমস্ত ময়লা ও আবর্জনা মাটিতে পুঁতিয়া বা পোড়াইয়া ফেলা উচিত।

(২) কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির মলমূত্র, বমি প্রভৃতিতে যাহাতে মাছি বসিতে না পারে, সে

বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। রোগীর মলমূত্রাদি তৎক্ষণাৎ পোড়াইয়া বা মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিলে মাছি দ্বারা এই সমস্ত রোগ সংক্রমিত হইতে পারে না।

(৩) যক্ষ্মা রোগীর থুথু, কাসি প্রভৃতিতে এবং বসন্ত রোগীর গায়ে যাহাতে মাছি বসিতে না পারে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিলে মাছি দ্বারা এই সমস্ত রোগ সংক্রমিত হইতে পারে না। এজন্য যক্ষ্মা রোগীর কফ, কাসি প্রভৃতি নির্দিষ্ট পাত্রে রাখিয়া পোড়াইয়া ফেলিবে এবং বসন্ত রোগীকে সর্বদা মশারির ভিতরে রাখিবে।

(৪) সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্য সর্বদা ঢাকিয়া রাখিবে। কাচ বা সূক্ষ্ম জাল দিয়া ঘেরা আলমারিতে খাবার জিনিস রাখিলে উহাতে মাছি বসিতে পারে না। বাজারের খাবার অনেক সময় অনাবৃত অবস্থায় থাকে বলিয়া এগুলি প্রায়ই মাছি দ্বারা দূষিত হয়। এজন্য **বাজারের খাবার বিষের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে**। ভাত খাইবার সময় পাতে মাছি বসিতে দিবে না।

৪। **জল দ্বারা রোগের সংক্রমণ**—জল ব্যতীত আমরা দুই-চারি দিনও জীবনধারণ করিতে পারি না। এইজন্যই জলের আর এক নাম **জীবন**। কিন্তু যে জল আমাদের জীবনধারণের জন্য এত আবশ্যক, সেই জলই আবার দূষিত হইলে আমাদের প্রাণনাশের কারণ হয়।

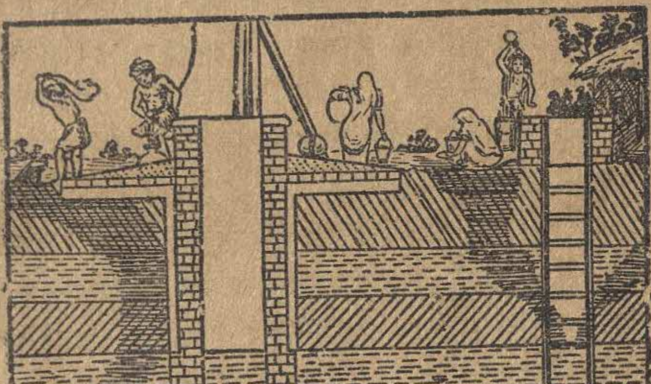
কলেরা, টাইফয়েড, রক্তামশায় প্রভৃতি রোগের জীবাণু সাধারণতঃ জল ও মাছি দ্বারাই সংক্রমিত হয়। পল্লীগ্রামের লোকেরা এই সমস্ত বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। এই সমস্ত রোগ যে

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জীবাণু হইতে উৎপন্ন হয় এবং রোগীর মল-মূত্রাদিতে যে এই সমস্ত জীবাণু অসংখ্য পরিমাণে থাকে, তাহা তাহারা জানে না। এজন্য তাহারা রোগীর মলমূত্র-মাখা বিছানা ও কাপড়-চোপড় নদী, পুকুর প্রভৃতিতে ধৌত করিয়া জল দূষিত করিয়া ফেলে এবং সুস্থ লোকেরা এই দূষিত জল পান করিয়া রোগে আক্রান্ত হয়। কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ের নিকটে পায়খানা রাখিলে মলমূত্রাদি বৃষ্টির জলের সঙ্গে মাটির ভিতর দিয়া চুয়াইয়া গিয়া জলাশয়ের জল দূষিত করে। এই সমস্ত বিষয়ে অজ্ঞতা ও অসাবধানতাবশতঃ পল্লীগ্রামে এক ব্যক্তির কলেরা প্রভৃতি রোগ দেখা দিলে দলে দলে লোক এই সমস্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এজন্য পানীয় জলের বিশুদ্ধি সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক।

নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মানিয়া চলিলে জলের দ্বারা রোগের সংক্রমণ বহুল পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে :—

(১) পানীয় জলের জন্য পৃথক্ পুকুর রাখিবে। এই পুকুরে যাহাতে কেহ স্নান করিতে, কাপড় কাচিতে, বাসন মাজিতে বা গরু-বাছুর স্নান করাইতে না পারে, সেজন্য ইহার চতুষ্পার্শে বেড়া দিয়া ঘিরিয়া রাখা আবশ্যক। পুকুর হইতে পাম্প দিয়া জল তুলিবার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। পাম্পের অভাবে জলের ধারে একটি মাচান তৈয়ার করিয়া উহাতে একটি বালতি ঝুলাইয়া রাখিলেও চলিতে পারে। ঐ বালতি ব্যতীত অপর কোন পাত্র দ্বারা পুকুর হইতে কাহাকেও জল তুলিতে দিবে না

(২) পুকুরের পাড় বাহিরের দিকে ক্রমান্বয়ে ঢালু করিয়া দিলে বর্ষাকালে বৃষ্টির জলের সহিত নানা প্রকার ময়লা ও আবর্জনা গিয়া পুকুরে পড়িতে পারে না। পুকুরের চতুষ্পার্শ্বে অন্ততঃ পঞ্চাশ হাত পরিমিত স্থানের মধ্যে পায়খানা করিবে না, রোগীর মলমূত্রাদি নিক্ষেপ করিবে না এবং রোগীর মলমূত্র-মাখা কাপড়-চোপড় ধৌত করিবে না।



পাকা গাঁথুনির কূপ ও কাঁচা গাঁথুনির কূপ

(৩) কূপের জল পানের জন্য ব্যবহার করিলে কূপের মুখ ঢাকিয়া দিয়া পাম্প বসাইয়া দিবে। ইহাতে উপর হইতে কোন দূষিত পদার্থ কূপের ভিতর পড়িতে পারিবে না এবং জল তুলিবার বালতি বা দড়ি দ্বারাও জল দূষিত হইতে পারিবে না।

(৪) কূপের পাড় হইতে ৩০।৪০ হাতের মধ্যে স্নান করিবে না, বাসন মাজিবে না, কাপড় কাচিবে না, মলমূত্র ত্যাগ করিবে না এবং রোগীর মলমূত্রাদির দ্বারা দূষিত বস্ত্রাদিও ধৌত করিবে না।

(৫) জল দূষিত হইবার যত প্রকার কারণ আছে, সেই সমস্ত কারণেই নদীর জলও দূষিত হইয়া থাকে। পুকুর ও কূপ সম্বন্ধে যে সমস্ত উপায় অবলম্বন করা যায়, নদী সম্বন্ধে সে সমস্ত উপায় অবলম্বন করা সম্ভবপর নহে। এজন্য নদীর জল পানের জন্য ব্যবহার না করাই ভাল। অন্য জলাশয় না থাকিলে নদীর জল বিশোধন করিয়া পান করা উচিত।

(৬) নলকূপ ও গভীর কূপের জল অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ। এজন্য নদী, পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ের জল অন্য কাজের জন্য ব্যবহার করিয়া পানের জন্য নলকূপ বা গভীর কূপের জল ব্যবহার করিবে।

(৭) জল বিশুদ্ধ কিনা তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। এজন্য সকল প্রকার জলই সিদ্ধ করিয়া লওয়াই নিরাপদ। জল সিদ্ধ করিলে জীবাণুসমূহ মরিয়া যায়। পরে এই জলে একটু ফটকিরি দিয়া কিছুকাল রাখিয়া দিলে ময়লা তলায় পড়ে। তখন উপর হইতে পরিষ্কৃত জল ঢালিয়া লইয়া পান করিবে। মনে রাখিবে, সামান্য গরমে জলের দোষ নষ্ট হয় না। **বিশ মিনিট কাল উত্তমরূপে ফুটাইলে সমস্ত জীবাণু মরিয়া যায় এবং জল নির্দোষ হয়।**

৫। **দূষিত তরল পদার্থ দ্বারা রোগের সংক্রমণ**—পল্লীগ্রামে প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতেই রান্নাঘরের পাশে একটি করিয়া আঁস্তাকুড় থাকে। এখানে বাড়ীর সকলে হাত-মুখ ধোয়, প্রস্রাব করে এবং ভাতের ফেন, রান্নাঘরের অপরিষ্কৃত জল, মাছের আঁইশ, তরকারির খোসা, শিশুদের মল প্রভৃতি ফেলে। এই সমস্ত দূষিত পদার্থ পচিয়া উহা হইতে যে দূষিত গ্যাস উঠে, তাহা দ্বারা বাড়ীর বায়ু দূষিত হইয়া যায়। তরল ময়লার জলীয় অংশ আঁস্তাকুড়ের মাটিতে বসিয়া যায় বলিয়া স্থানটি সর্বদাই সেঁতসেঁতে থাকে। **এইরূপ সেঁতসেঁতে জায়গা রোগ-জীবাণুর জন্মভূমি।** অধিকাংশ রোগের জীবাণু এইরূপ নোংরা সেঁতসেঁতে জায়গায় বাঁচে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ, পচা ময়লা ও আবর্জনাতেই মাছি ডিম পাড়ে। এই সমস্ত মাছি আঁস্তাকুড়ের দূষিত পদার্থ আহার করিয়া জীবনধারণ করে। ইহারা আবার আমাদের খাদ্যদ্রব্যে বসিয়া তাহা রোগের জীবাণু দ্বারা দূষিত করে।

দূষিত তরল পদার্থের মধ্যে মানুষের মলমূত্রের স্যায় অনিষ্টকারী পদার্থ আর নাই। বড় বড় শহরে দূষিত তরল ময়লা ভূগর্ভস্থ নরদমার সাহায্যে শহর হইতে দূরে কোন নদীতে ফেলা হয়। ছোট ছোট শহরে পায়খানাও প্রত্যহ মেথর দ্বারা পরিষ্কার করার বন্দোবস্ত থাকায় কোথাও মলমূত্র সঞ্চিত হইবার আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু পল্লীগ্রামে প্রায়ই পায়খানার মলমূত্রাদি ও অন্যান্য তরল ময়লা দূর করিবার কোন বন্দোবস্ত

থাকে না। পায়খানার মলমূত্র পায়খানাতেই সঞ্চিত হইতে থাকে। বর্ষাকালে জল জমিয়া পায়খানার এমন দুরবস্থা হয় যে, ঐ মলমূত্রমিশ্রিত জল জমিয়া পায়খানা ছাপাইয়া উঠিয়া চারিদিকে গড়াইয়া পড়ে। ইহাতে পানীয় জলের কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি দূষিত হয়। এই দূষিত জল পান করিয়া গ্রামের অধিবাসিগণ নানাবিধ সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হয়।

দূষিত তরল পদার্থ দ্বারা যে সমস্ত রোগ সংক্রমিত হয়, তাহার মধ্যে কলেরা, টাইফয়েড, রক্তামশায় ও বক্রকৃমি রোগই প্রধান। কলেরা প্রভৃতি রোগের সংক্রমণ সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে।

বক্রকৃমি রোগ—বঙ্গদেশে বক্রকৃমি রোগের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত বেশি। শতকরা প্রায় ৮০ জনেরই এই রোগ আছে



বক্রকৃমি

বলিয়া প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বক্রকৃমি প্রায় আধ ইঞ্চি লম্বা এক প্রকার কীট-বিশেষ। ইহারা মানুষের উদরে প্রবেশ করিয়া অন্ত্রের গা জড়াইয়া থাকে, সেখানে ডিম পাড়ে এবং শরীরের

রক্ত শুষিয়া খায়। বক্রকৃমি রোগ হইলে শরীর দুর্বল হইয়া পড়ে, রক্ত কমিয়া যায় এবং পরিপাক-শক্তি হ্রাস পায়। এই রোগে আক্রান্ত হইলে শিশুদের শরীর রীতিমত বৃদ্ধি পায় না।

আমাদের দেশের পল্লীগ্রামে মলত্যাগের ভাল ব্যবস্থা নাই। লোকে রাস্তার ধারে, পুকুরের পাড়ে, বাগানে, শস্যক্ষেত্রে ও পতিত জমিতে মলত্যাগ করিয়া ভূমি দূষিত করে। যাহাদের উদরে বক্রকৃমি আছে, তাহাদের মলের সঙ্গে অসংখ্য বক্রকৃমির ডিম বাহির হয়। এই ডিম ফুটিয়া ছোট ছোট কৃমি জন্মে। যে সকল স্থান বক্রকৃমির ডিম্বমিশ্রিত মল দ্বারা দূষিত হইয়াছে, সেই সমস্ত স্থানে খালি পায়ে হাঁটিলে ঐ কৃমি পায়ে লাগিয়া যায় এবং পায়ের চামড়া ভেদ করিয়া শরীরে প্রবেশ করে ও বক্রকৃমি রোগ উৎপাদন করে। বক্রকৃমির ডিম্বমিশ্রিত জল পান করিলেও সেই ডিম্ব উদরস্থ হইয়া এই রোগ জন্মায়।



কিরূপে বক্রকৃমি শরীরে প্রবেশ করে

বক্রকৃমি রোগের সংক্রমণ নিবারণ করিতে হইলে নির্দিষ্ট পায়খানা ব্যতীত অন্যত্র মলত্যাগের অভ্যাস ত্যাগ করা একান্ত আবশ্যক। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, যাহারা খালি পায়ে চলাফেরা করে তাহাদের চেয়ে যাহারা জুতা ব্যবহার করে, তাহারা এই রোগে কম আক্রান্ত হয়। সুতরাং জুতা ব্যবহার

করিলে এবং মলত্যাগের জন্য নির্দিষ্ট পায়খানার বন্দোবস্ত করিলে বক্রকৃমি রোগ বিস্তৃত হইতে পারে না। যাহাতে জলের সহিত বক্রকৃমির ডিম্ব উদরস্থ না হয়, তজ্জন্য জল ফুটাইয়া পান করা উচিত।

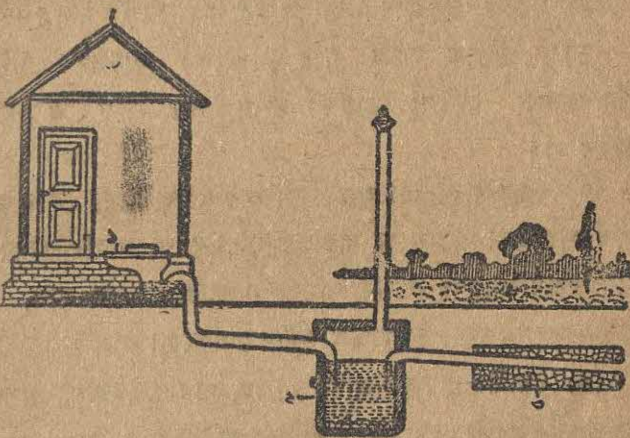
দূষিত তরল পদার্থ দ্বারা যাহাতে রোগের সংক্রমণ না হইতে পারে, তজ্জন্য নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করা আবশ্যক :—

(১) বাসগৃহ হইতে কিছু দূরে উত্তর বা পশ্চিম দিকে আঁস্তাকুড় করিবে। যেখানে সূর্যকিরণ ও বায়ু অবাধে প্রবেশ করিতে পারে, এরূপ স্থানেই আঁস্তাকুড় করিবে এবং ইহার সহিত এমনভাবে একটি নরদমা সংযুক্ত করিয়া দিবে, যাহাতে বাড়ীর সমস্ত তরল ময়লা গড়াইয়া দূরে চলিয়া যায়। নরদমাটি পাকা হইলে ভাল হয়। এই নরদমা প্রত্যহ পরিষ্কার করিবে এবং জলের সহিত ফিনাইল মিশাইয়া নরদমায় ঢালিয়া দিবে।

(২) যেখানে রান্নাঘরের অপরিষ্কৃত জল, ভাতের ফেন প্রভৃতি তরল ময়লা ফেলা হয়, সেখানে মাছের আঁইশ, তরকারির খোসা প্রভৃতি শুষ্ক আবর্জনা ফেলিবে না। ইহাতে এগুলি তরল ময়লার সহিত মিশিয়া পচিতে পারিবে না। শুষ্ক ও তরল ময়লার জন্য পৃথক পৃথক স্থান নির্দিষ্ট করিয়া লইবে।

(৩) বাড়ী হইতে অন্ততঃ ৫০ হাত দূরে গোয়ালঘর নির্মাণ করিবে এবং উহার সহিত এমনভাবে একটি নরদমা সংযুক্ত করিয়া দিবে যেন চোনা গড়াইয়া দূরে চলিয়া যায়। বাড়ী হইতে দূরে এক বা দেড় হাত গভীর গর্ত করিয়া তাহাতে গোবর পুঁতিয়া শুখনা মাটি চাপা দিবে।

(৪) যেখানে সেখানে মলত্যাগ না করিয়া বাড়ীতে একটি নির্দিষ্ট পায়খানা রাখিবে। বর্ষাকালে যাহাতে পায়খানার ময়লা বৃষ্টির জলের সহিত গড়াইয়া নিকটবর্তী জলাশয়ের জল দূষিত না করে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পল্লীগ্রামে পাকা পায়খানা নির্মাণ করিয়া উহার সহিত সেপ্‌টিক ট্যাঙ্ক বা মলশোধক প্রকোষ্ঠ যোগ করিয়া লইলে পায়খানার মল নির্দোষ



মলশোধক পায়খানা

তরল পদার্থে পরিণত হইয়া মাটিতে শুষিয়া যাইতে পারে। ইহাতে নিকটবর্তী জলাশয়ের জল দূষিত হইতে পারে না।

(৫) পুকুর বা কূপের পাড় হইতে অন্ততঃ ৫০ হাতের মধ্যে স্নান করিবে না, কাপড় কাচিবে না, বাসন মাজিবে না, মলমূত্র ত্যাগ করিবে না এবং শিশু ও রোগীর মলমূত্র-মাখা কাপড়-চোপড় ধৌত করিবে না।

শিশুদিগের মলমূত্র যেখানে সেখানে না ফেলিয়া নির্দিষ্ট পায়খানায় ফেলিবে। রোগীর মল, মূত্র, বমি, কাসি, থুথু প্রভৃতি ফিনাইল বা অন্য কোন রোগবীজনাশক দ্রব্যের সহিত মিশাইয়া পোড়াইয়া ফেলিবে বা মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিবে।

সংক্রমণ নিবারণের উপায়—সংক্রাক রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে নিম্নলিখিত উপায়গুলি অবলম্বন করিলে রোগের সংক্রমণ অনেক পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে। যথা :—

(১) রোগীকে পৃথক্ ঘরে রাখিবে। যাহারা রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করিবে, তাহারা ছাড়া অন্য কেহ সে ঘরে যাইবে না।

(২) শুশ্রূষাকারীরা অন্য কাহাকেও বা বাহিরের কোন বস্তু স্পর্শ করিবে না। অন্যের সহিত মেলামেশা বা আহার করিবার পূর্বে শুশ্রূষাকারিগণ বস্ত্রাদি পরিবর্তন করিবে এবং হাত, পা প্রভৃতি সাবান দ্বারা উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলিবে।

(৩) রোগীর ব্যবহৃত জামা, কাপড়, গামছা, বিছানা, বাসন-পত্র প্রভৃতি রোগীর ঘর হইতে বাহিরে আনিবে না বা ব্যবহার করিবে না। রোগী আরোগ্যলাভ করিলে তাহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি ভালরূপে সিদ্ধ করিয়া ধুইয়া লইবে অথবা কোন রোগবীজনাশক দ্রব্যের দ্বারা বিশোধন করিয়া লইবে। লেপ, তোষক প্রভৃতি যে সমস্ত দ্রব্য বিশোধন করা যায় না, তাহা পোড়াইয়া ফেলা উচিত।

(৪) রোগীর মল, মূত্র, বমি প্রভৃতি যেখানে সেখানে না ফেলিয়া, হয় পোড়াইয়া ফেলিবে, নয় মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিবে।

(৫) রোগী আরোগ্যলাভ করিলে বা রোগীর মৃত্যু হইলে তাহার গৃহ ব্যবহার করিবার পূর্বে উত্তমরূপে বিশোধন করিয়া লইবে। পাকা ঘর হইলে ঘরের মেঝে ও দেওয়াল ফিনাইল বা কার্বলিক এসিড-মিশ্রিত জল দ্বারা উত্তমরূপে ধৌত করিয়া চূণকাম করিবে। কাঁচা ঘর হইলে ঘরের মেঝে হইতে ৩।৪ ইঞ্চি মাটি তুলিয়া ফেলিয়া তাহার উপর নূতন মাটি দিবে। ঘরের বেড়া, খুঁটি প্রভৃতি রোগবীজনাশক দ্রব্য দ্বারা উত্তমরূপে ধুইয়া ফেলিবে। ব্যবহার করিবার পূর্বে কয়েকদিন এই ঘরের সমস্ত দরজা-জানালা খোলা রাখিবে।

অনুশীলনী

১। সংক্রামক রোগ কাহাকে বলে? কয়েকটির নাম কর।

২। দাদ, পাঁচড়া প্রভৃতি রোগকে স্পর্শাক্রামক রোগ বলে কেন? বসন্ত-রোগকে স্পর্শাক্রমক রোগ বলা যায় কি?

৩। সংক্রামক রোগের জীবাণু সম্বন্ধে যাহা জান বল।

৪। রোগ-প্রতিষেধক শক্তি কাহাকে বলে? রোগমুক্তির পরও কিছুকাল পর্যন্ত সংক্রামক রোগীর সহিত মেশা উচিত নয় কেন?

৫। বিভিন্ন সংক্রামক রোগের জীবাণু কোন্ কোন্ পথ দিয়া আমাদের শরীরে প্রবেশ করে?

৬। কি কি উপায়ে সংক্রামক ব্যাধি অসুস্থ ব্যক্তির দেহ হইতে সুস্থ ব্যক্তির দেহে সংক্রমিত হয়?

৭। রোগীর সংস্পর্শ দ্বারা কি কি রোগ সংক্রমিত হয়?

৮। জল দ্বারা কোন্ কোন্ রোগ কিরূপে সংক্রমিত হইয়া থাকে?

৯। ধূলাবালি দ্বারা রোগের সংক্রমণ নিবারণ করিতে হইলে কি কি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক?

১০। মাছি মানুষের পরম শত্রু কেন? কিরূপে মাছি দ্বারা রোগ সংক্রমিত হয়?

দ্বিতীয় অধ্যায়

স্বাস্থ্য-বিধি লঙ্ঘন

সুস্থ থাকাই শরীরের স্বাভাবিক অবস্থা। শরীরের অস্বাভাবিক অবস্থার নামই অসুস্থতা বা পীড়া। শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে কতকগুলি নিয়ম পালন করিয়া চলিতে হয়। এই নিয়মগুলিকে স্বাস্থ্যবিধি বা স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম বলে। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলি পালন করিয়া চলিলে সুস্থ দেহে দীর্ঘকাল জীবনধারণ করিতে পারা যায়। আর স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন করিলে রোগ-যন্ত্রণায় কষ্ট পাইয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হয়।

আমাদের যতপ্রকার রোগ হয়, তাহার অধিকাংশেরই কোন না কোন কারণ নিহিত থাকে। কাহারও জ্বর হইলে বুঝিতে হইবে, সে অতিরিক্ত জলে ভিজিয়াছে বা রৌদ্র লাগাইয়াছে অথবা এমন কিছু করিয়াছে যাহাতে জ্বর হইতে পারে। কাহারও পেটের অসুখ হইলে বুঝিতে হইবে, সে কোন গুরুপাক দ্রব্য বা দূষিত খাদ্য আহার করিয়াছে। কাহারও খোস, পাঁচড়া বা দাদ হইলে বুঝিতে হইবে, শরীরের বা পোষাক-পরিচ্ছদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে সে উদাসীন।

জল, বায়ু, খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদ ও বাসস্থানের উপরই আমাদের স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে।

বিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিলে, বিশুদ্ধ জল পান করিলে, বিশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্য আহার করিলে, পরিষ্কৃত পোষাক-পরিচ্ছদ

পরিধান করিলে এবং স্বাস্থ্যকর গৃহে বাস করিলে আমাদের স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু এগুলি সম্বন্ধে স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন করিলে আমাদের নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইতে হয়। আমরা কি কি উপায়ে এই কয়েকটি বিশেষ স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন করি এবং উহার ফলে নানা প্রকার ব্যাধিতে আক্রান্ত হই, তাহা নিম্নে আলোচিত হইল।

(১) **জল সম্বন্ধে স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন**—তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ, কলেরা, টাইফয়েড, রক্তামাশয় প্রভৃতি রোগের জীবাণু জলের দ্বারা সংক্রমিত হয়। সুতরাং জল সম্বন্ধে স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন করিলে এই সমস্ত রোগ উৎপন্ন হয়।

পল্লীগ্রামে লোকে একই পুকুরে স্নান করে, কাপড় কাচে, বাসন মাজে, গরু-বাছুর স্নান করায়, বাঁশ, পাট প্রভৃতি পচায়, এমন কি শিশু ও রোগীর মলমূত্র-মাখা কাপড়-চোপড় ধৌত করে; আবার সেই পুকুরের জলই তাহারা পানের জন্য ব্যবহার করে। এই জল পান করার ফলে যে রোগের সৃষ্টি হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি?

লোকে পুকুরের পাড়ে এবং নদী, খাল প্রভৃতির ধারে মলত্যাগ করে। বর্ষাকালে এই সমস্ত মল বৃষ্টির জলের সহিত গড়াইয়া গিয়া জল দূষিত করে। কলেরা প্রভৃতি সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির মলমূত্রাদির দ্বারা দূষিত বস্ত্রাদি নদীতে ধৌত করার ফলে নদীর ধারের বহুদূরবর্তী স্থানেও এই সমস্ত রোগের জীবাণু সংক্রমিত হইতে দেখা যায়। পল্লীগ্রামের অজ্ঞ লোকেরা নদী, খাল, বিল প্রভৃতির জলে মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুর মৃতদেহ নিক্ষেপ করে।

অনেকে কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ের নিকট পায়খানা, গোয়ালঘর, আস্তাবল প্রভৃতি নির্মাণ করে। এই সকল স্থানের দূষিত পদার্থের চুয়ানি মাটির ভিতর দিয়া আসিয়া জলাশয়ের জল দূষিত করে। জলাশয়ের নিকটে মৃতদেহ কবর দিলে উহা পচিয়া উহার জলীয়াংশ চুয়াইয়া গিয়া জলাশয়ের জল দূষিত করে।

(২) **বায়ু সম্বন্ধে স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন**—আমাদের জীবন-রক্ষার জন্য বায়ু অপেক্ষা প্রয়োজনীয় বস্তু আর নাই। কিন্তু দূষিত হইলে এই বায়ুই আবার আমাদের প্রাণনাশের কারণ হয়। বায়ু সম্বন্ধে স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘনের ফলে নিউমোনিয়া, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, ডিপ্‌থিরিয়া, হাম, বসন্ত, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

অনেকে রাত্রিকালে শয়নগৃহের সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া শয়ন করে। ইহাতে গৃহের দূষিত বায়ুও বাহির হইতে পারে না, বাহিরের বিশুদ্ধ বায়ুও গৃহে প্রবেশ করিতে পারে না। তাহা ছাড়া একই গৃহে এবং কখন কখন একই মশারির ভিতরে বহু লোক শয়ন করে। ইহাতে বহু লোকের শ্বাসপ্রশ্বাসে গৃহের বায়ু দূষিত হইয়া যায়। অনেকে আবার দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া গৃহে আলো জ্বালিয়া শয়ন করে। অগ্নি জ্বালিলে বায়ুতে অঙ্গারাম্ল গ্যাসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় বলিয়া ইহাতে গৃহের বায়ু দূষিত হইয়া পড়ে; দীর্ঘকাল এইরূপ দূষিত বায়ু সেবন করিলে জীবনীশক্তি হ্রাস পায়। রুদ্ধদ্বার সূতিকা গৃহে আলো জ্বালিয়া রাখার ফলে প্রসূতির মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে শুনা গিয়াছে।

ঘরের মেঝে বা দেওয়ালে থুথু, কাসি প্রভৃতি ফেলিলে, যেখানে সেখানে মলত্যাগ করিলে এবং বাড়ীর ভিতরে বা নিকটে রোগীর

মলমূত্রাদি নিক্ষেপ করিলে এই সমস্ত দূষিত পদার্থ শুকাইয়া ধূলিকণার আকারে বায়ুর সহিত মিশিয়া শ্বাসবায়ুর সহিত আমাদের শরীরে প্রবেশ করে। এই সমস্ত দূষিত পদার্থ দ্বারা আমাদের খাদ্যদ্রব্যও দূষিত হইয়া থাকে। এইরূপ দূষিত খাদ্য আহার করিলে যে রোগ জন্মিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি ?

অনেকে লেপ দিয়া নাকমুখ ঢাকিয়া শয়ন করে। ইহাতে শ্বাসপ্রশ্বাস-ক্রিয়ার ব্যাঘাত হয়। অনেকে আবার মুখ দিয়া শ্বাসগ্রহণ করে। ইহাতে ধূলাবালির সহিত নানা প্রকার রোগের জীবাণু মুখের ভিতর দিয়া শরীরে প্রবেশ করে। আমাদের নাসাপথে প্রচুর লোম ও এক প্রকার আঠাল পদার্থ থাকায় ধূলাবালি প্রভৃতি উহাতে আটকাইয়া যায়।

(৩) **খাদ্য সম্বন্ধে স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন**—উপযুক্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য আহার করিলে আমাদের শরীররক্ষা হয়। খাদ্য দূষিত হইলে উহাই আবার নানাবিধ রোগ উৎপাদন করে। আমাদের দেশের লোকে অজ্ঞতা ও অসাবধানতাবশতঃ অনেক সময় খাদ্য-দ্রব্য দূষিত করিয়া ফেলে। খাদ্য সম্বন্ধে স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন করিলে অজীর্ণ, কলেরা, টাইফয়েড, রক্তামাশয়, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগ জন্মে।

আমরা অনেক সময় খাবার জিনিস ঢাকিয়া রাখি না। ইহাতে ধূলাবালি পড়িয়া বা মাছি বসিয়া খাদ্যদ্রব্য দূষিত হইয়া যায়। মাছি দ্বারা যে নানাবিধ রোগ বিস্তৃত হয়, তাহা তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ।

বাড়ীর মেয়েরা অনেক সময় রান্না করিবার পূর্বে রন্ধন-পাত্রগুলি উত্তমরূপে ধৌত করেন না। এই সকল পাত্রে বাসি

ভাত-তরকারির যে সমস্ত কণা লাগিয়া থাকে তাহা পচিয়া খাদ্যের সহিত মিশিয়া যায়। ইহাতে অজীর্ণ, উদরাময় প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়।

অনেকে মাছ, মাংস প্রভৃতি পচিয়া গেলেও উহা ফেলিয়া না দিয়া রান্না করিয়া খায়। পল্লীগ্রামে অনেক বাড়ীর মেয়েরা বাসি ভাত ও তরকারি নিজেরা খাইয়া থাকেন এবং বাড়ীর ছেলেমেয়েদিগকে খাওয়ান। কোন কোন বাড়ীতে এক বেলার রান্না ভাত-তরকারি অন্য বেলায় খাওয়া হয়। তাঁহারা মনে করেন যে খাবার জিনিষে অম্লস্বাদ না হইলে টাটকা খাদ্যদ্রব্যের ন্যায় বিশুদ্ধ।

অনেক বাড়ীতে রান্নাঘরটির পরিচ্ছন্নতার প্রতি কোন লক্ষ্য নাই। রান্নাঘরের পাশে বা পিছনেই মাছের আঁইশ, তরকারির খোসা প্রভৃতি ফেলা হয়; এগুলি পচিয়া রান্নাঘরের বায়ু দূষিত হয়। অনেকে রান্নাঘরের নিকটে এমন কি আহারের স্থানের নিকটে কফ, কাসি বা থুথু ফেলে; ইহাতে রান্নাঘরে মাছির উপদ্রব হয় এবং সেই মাছি দ্বারা খাবার জিনিস দূষিত হয়।

শহরের লোকদের মধ্যে অনেকেই বাজারের খাবার খায়। এই সমস্ত খাবার প্রায়ই অনাবৃত অবস্থায় থাকে বলিয়া ধূলাবালিও মাছি প্রভৃতির দ্বারা দূষিত হয়।

আমরা অনেক সময় নাকে-মুখে ভাত গুঁজিয়া স্কুল, কলেজ, বা আফিসে ছুটি। ইহাতে খাদ্যদ্রব্য ভালরূপে চর্বিত হয় না বলিয়া পরিপাক-ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। অনেকের আবার আহারের কোন নির্দিষ্ট সময় নাই। কোনদিন দশটায়, কোন দিন বারোটায়, আবার কোন দিন বা দুইটার সময় আহার করে।

অনেকে নিমন্ত্রণে যাইয়া মাত্রার অতিরিক্ত খাইয়া ফেলে। কেহ কেহ বাজি রাখিয়া দুই-তিন সের রসগোল্লা বা একটা আস্ত কাঁঠাল খাইয়া ফেলে। আহার সম্বন্ধে স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘনের ফল অনেক সময়ে হাতে হাতেই পাওয়া যায়।

(৪) **পোষাক-পরিচ্ছদ সম্বন্ধে স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন**—শীত, তাপ ও বাহিরের ধূলাবালি হইতে শরীররক্ষার জন্য পরিচ্ছদের প্রয়োজন। পোষাক-পরিচ্ছদ যে শরীরের পক্ষে উপযোগী ও পরিষ্কৃত হওয়া আবশ্যক, তাহা অনেকেই বুঝে না। এজন্য পরিচ্ছদ সম্বন্ধে স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন করিয়া তাহারা খোস, পাঁচড়া, দাদ প্রভৃতি নানাবিধ চর্মরোগের সৃষ্টি করে।

আমাদের দেশে অনেকে এরূপ ময়লা কাপড়-চোপড় ব্যবহার করে যে, তাহাদিগকে দেখিলেই ঘৃণার উদ্রেক হয়। অনেকে সপ্তাহে একদিন ত দূরের কথা, মাসের মধ্যে একদিনও ময়লা কাপড় ও জামা কাচিয়া পরিষ্কার করে না। বাহিরের ময়লা হইতে শরীরকে রক্ষা করা কাপড়-চোপড় পরার একটি প্রধান উদ্দেশ্য। ময়লা কাপড়-চোপড় পরিলে উহার ময়লা লাগিয়া শরীর অপরিষ্কৃত হইয়া পড়ে।

রঙিন কাপড়ের ময়লা বেশী দেখা যায় না বলিয়া অনেকে উহা দ্বারা জামা প্রস্তুত করে। তাহাদের ধারণা যে, রঙিন কাপড়ের জামা দীর্ঘকাল না কাচিলেও চলে। কিন্তু ময়লা দেখা যাউক আর না যাউক, অপরিষ্কৃত পরিচ্ছদ পরিধান করিলে উহার ফল ভোগ করিতেই হইবে।

অনেকে খুব বেশী আঁটা জামা বা জুতা ব্যবহার করিয়া

থাকে। আঁটা জামা পরিলে রক্তসঞ্চালন-ক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে এবং আঁটা জুতা পায়ে দিলে পায়ের গঠন বিকৃত হইয়া যায়। অনেকে রাত্রিকালে জামা, গেঞ্জী প্রভৃতি গায়ে রাখিয়া শয়ন করে। ইহাতে রীতিমত রক্ত-চলাচল হইতে পারে না।

লোকে দেখিতে পাইবে না বলিয়া অনেকে পরিষ্কৃত শার্ট বা কোটের নীচে ময়লা গেঞ্জী, ফতুয়া প্রভৃতি ব্যবহার করে। অনেকে আবার বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় পরিষ্কৃত কাপড়-জামা পরিয়া থাকে, কিন্তু অন্য সময়ে ময়লা কাপড়-চোপড়ই পরে। আমাদের দেশের অনেকেই অন্যের ব্যবহৃত জামা, কাপড়, গামছা প্রভৃতি ব্যবহার করিতে সঙ্কোচ বোধ করেন না। ইহাতে যে নানা প্রকার ছোঁয়াচে রোগের সৃষ্টি হয়, তাহা তাঁহারা মোটেই বুঝেন না।

অনেকে পরিষ্কৃত পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে বটে, কিন্তু বিছানাপত্র নিতান্ত নোংরা করিয়া রাখে। তাহারা লেপের ওয়াড়, বালিসের খোল, বিছানার চাদর, মশারি প্রভৃতি পরিষ্কৃত রাখা আবশ্যক বলিয়া মনে করে না। এইরূপ নোংরা বিছানা ছারপোকার আড্ডা। এই সমস্ত ছারপোকা শরীরের রক্ত শুষিয়া খায় এবং সেই সঙ্গে নানাবিধ রোগের বীজ শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেয়।

(৫) **বাসস্থান সম্বন্ধে স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন**—তোমরা বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবে, কোন কোন বাড়ীতে অসুখ-বিসুখ লাগিয়াই আছে। ইহার কারণ কি? স্বাস্থ্যরক্ষার সমস্ত নিয়ম পালন করিয়া চলিলেও অস্বাস্থ্যকর বাড়ীতে বাস করিয়া

কিছুতেই স্বাস্থ্যরক্ষা করা যায় না ; বাসস্থান সম্বন্ধে স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন করিলে সর্দি, ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, বাত, যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, আমাশয় প্রভৃতি রোগ উৎপন্ন হয়।

শহরে অনেকে সরু গলির ভিতরে বা চতুর্দিকে উঁচু উঁচু বাড়ী দিয়া ঘেরা জায়গায় বাড়ী তৈয়ার করে। পল্লীগ্রামে অনেকে বাড়ীর চারিধারে আম, কাঁঠাল প্রভৃতি বড় বড় বৃক্ষ রোপণ করে। এরূপ বাটীতে বায়ু ও সূর্যালোক প্রবেশ করিতে পারে না। ইংরাজীতে একটি কথা আছে ; ইহার অর্থ এই যে 'যে বাড়ীতে বায়ু ও সূর্যালোক প্রবেশ করে না, সে বাড়ীতে চিকিৎসককে ঘন ঘন আসিতে হয়।'

অনেকে পচা পুকুর, ডোবা প্রভৃতি ভরাট করিয়া বাটী নির্মাণ করিয়া থাকে। এরূপ বাড়ীর জমি সর্বদাই সেঁতসেঁতে থাকে বলিয়া উহা হইতে দূষিত গ্যাস উঠিয়া বাড়ীর বায়ু দূষিত করিয়া ফেলে। অনেক বাড়ীতে জল নিকাশের কোন ব্যবস্থা নাই। বর্ষাকালে বৃষ্টির জল মাটিতে বসিয়া গিয়া বাড়ী সেঁতসেঁতে হইয়া যায়।

অনেকে বাড়ীর নিকটে পচা পুকুর প্রভৃতি রাখে এবং বাটীর চতুষ্পার্শ্বস্থ জমিতে গর্ত খুঁড়িয়া মাটি তুলে। এই সমস্ত স্থানে মশার জন্ম হয় বলিয়া বাড়ীর লোকদের প্রায়ই ম্যালেরিয়া-জ্বরে ভুগিতে হয়।

পল্লীগ্রামে অনেক বাড়ীতে শয়নগৃহ বা রন্ধনশালার নিকটে গোয়ালঘর, আস্তাবল, আঁস্তাকুড়, প্রস্রাবের স্থান, পায়খানা প্রভৃতি রাখা হয়। কোন বাড়ীতে রন্নাঘরের পাশে বা পিছনেই

মাছের আঁইশ, শাকসবজির পরিত্যক্ত অংশ প্রভৃতি ফেলা হয়, উঠান ঝাঁট দিয়া উঠানের কোণেই আবর্জনা জমাইয়া রাখা হয় এবং গোয়ালঘরের পাশেই গোবর স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হয়। এই সমস্ত দূষিত পদার্থ পচিয়া বাড়ীতে দুর্গন্ধ হয় এবং ইহা দ্বারা বাড়ীর বায়ু দূষিত হইয়া পড়ে।

অনুশীলনী

১। স্বাস্থ্যবিধি কাহাকে বলে? স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন করিলে কি হয়?

২। জল ও খাদ্য সম্বন্ধে স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘন করিলে কি কি রোগ জন্মে?

৩। বায়ু ও বাসস্থান সম্বন্ধে স্বাস্থ্যবিধি লঙ্ঘনের কয়েকটি দৃষ্টান্ত দাও।

যেখানে সেখানে থুথ ফেলার অনিষ্টকারিতা

যেখানে সেখানে কফ, কাসি বা থুথু ফেলা যে স্বাস্থ্যের পক্ষে কতদূর অনিষ্টকর, তাহা আমাদের দেশের লোকে মোটেই বুঝে না। এজন্য অনেকেই উঠানে, ঘরের কোণে, মেঝের উপর, বেড়া বা দেওয়ালে গায়ে এবং পুকুর প্রভৃতি জলাশয়ের জলে কফ, কাসি, থুথু প্রভৃতি ফেলে। ইহাতে যে কেবল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার হানি হয়, তাহা নহে; ইহাতে নানাবিধ ব্যাধিরও বিস্তার সাধিত হয়।

পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, আমাদের মুখগহ্বরে লক্ষ লক্ষ নানা জাতীয় জীবাণু থাকে। ইহাদের মধ্যে সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া, ডিপ্থিরিয়া প্রভৃতি রোগের জীবাণুই প্রধান। ইহারা মুখগহ্বরে থাকিয়া সর্বদা আমাদের দেহকে আক্রমণ করিবার সুযোগ খুঁজিতেছে। সুতরাং আমাদের থুথু যে কিরূপ ভীষণ পদার্থ, তাহা তোমরা সহজেই বুঝিতে পার। সুস্থ ব্যক্তির থুথুই যদি এরূপ ভয়ানক হয়, তাহা হইলে পীড়িত ব্যক্তির থুথু যে কিরূপ সাংঘাতিক জিনিস, তাহা তোমরা অনায়াসে বুঝিতে পার।

যক্ষ্মা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডিপ্থিরিয়া প্রভৃতি রোগ যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জীবাণু হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ। এই সমস্ত রোগের জীবাণু কফ, কাসি, থুথু প্রভৃতির সহিত রোগীর দেহ হইতে নির্গত হয়। এক বিন্দু থুথু বা কাসিতে সমস্ত রোগের শত শত জীবাণু থাকিতে পারে। তোমরা লক্ষ্য

করিয়া থাকিবে, কাসি, থুথু প্রভৃতি উপর সর্বদাই মাছি বসিয়া থাকে। পরে এই মাছি খাবার জিনিসে বসিয়া তাহাতে রোগের বীজ ছড়াইয়া দেয়। কাসি, থুথু প্রভৃতি শুকাইয়া গেলেও উহা হইতে রোগের জীবাণুসমূহ অতি ক্ষুদ্র ধূলিকণার আকারে বাতাসের সাহায্যে নাক দিয়া অথবা খাদ্যদ্রব্যের সহিত মিশিয়া আমাদের শরীরে প্রবেশ করে।



মাছি এইরূপে থুথু দ্বারা যক্ষ্মার জীবাণু ছড়ায়

মলমূত্র যেরূপ আমাদের শরীর হইতে নির্গত দূষিত পদার্থ, কফ, কাসি বা থুথুও সেইরূপ দূষিত পদার্থ। যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ করিলেও যেমন নানাবিধ রোগের উৎপত্তি হয়, যেখানে সেখানে কফ, কাসি বা থুথু ফেলিলেও সেইরূপ রোগের সৃষ্টি হয়। সুতরাং যেখানে সেখানে কফ, কাসি বা থুথু ফেলা নিতান্ত অন্যায়।

আজকাল বাংলাদেশে যক্ষ্মা-রোগের প্রকোপ অত্যন্ত বেশি। এই কলিকাতা শহরেই প্রায় ত্রিশ হাজার যক্ষ্মা-রোগী আছে। ইহাদের মধ্যে অনেকে রাস্তাঘাটে চলাফেরা করিয়া থাকে। ইহারা সর্বদাই রাস্তাঘাটে থুথু ফেলিতেছে। এই থুথু শুকাইয়া রাস্তার ধূলাবালির সঙ্গে মিশিয়া বায়ু দ্বারা বাহিত হইয়া সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করিয়া যক্ষ্মা-রোগীর সংখ্যাবৃদ্ধি করিতেছে। ইহা হইতে তোমরা বুঝিতে পারিতেছ, **যেখানে সেখানে থুথু ফেলাই যক্ষ্মা-রোগ বিস্তারের একটি প্রধান কারণ।**

প্রত্যেক বাড়ীতে কফ, কাসি বা থুথু ফেলার জন্য একটি পিকদানি বা অন্য কোন নির্দিষ্ট পাত্র রাখিবে। ইহাতে কিছু কার্বলিক লোশন রাখিয়া উহাতে বাড়ীর সকলে থুথু, কাসি প্রভৃতি ফেলিবে। প্রত্যহ একবার এই পাত্রের থুথু প্রভৃতি বাড়ী হইতে দূরে ফেলিয়া দিবে এবং পাত্রটি গরম জল দিয়া ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিবে। কখনও উঠানে, ঘরের কোণে, মেঝেতে বা বেড়াতে কিংবা পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয়ের জলে কফ, কাসি বা থুথু ফেলিবে না।

রেলগাড়ী, ষ্টীমার, হাট-বাজার, বিদ্যালয়, সভাগৃহ, থিয়েটার প্রভৃতি যে সমস্ত স্থানে একসঙ্গে বহু লোকের সমাগম হয়, সে সমস্ত স্থানে কখনও কফ, কাসি বা থুথু ফেলিবে না। এই সমস্ত স্থানে থুথু ফেলিলে রোগের জীবাণু একই সময়ে বহু লোকের শরীরে প্রবেশ করিয়া রোগ উৎপাদন করিতে পারে। প্রয়োজন হইলে এই সমস্ত স্থানে রুমালে থুথু ফেলিয়া পরে বাড়ীতে আসিয়া উহা কাচিয়া ফেলিবে।

কাসি বা থুথু কখনও গিলিয়া ফেলিবে না। হাঁচিবার ও কাসিবার সময়ে রুমাল বা ন্যাকড়া দিয়া নাক ও মুখ ঢাকিয়া লইবে। এরূপ করিলে নাক ও মুখ হইতে শ্লেষ্মার কণা চারিদিকে চড়াইয়া পড়িতে পারে না। সর্দি হইলে যেখানে সেখানে নাক ঝাড়িবে না।

যক্ষ্মা, ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডিপ্থিরিয়া প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিগণ কখনও নির্দিষ্ট পাত্র ব্যতীত অন্য কোথাও থুথু বা কাসি ফেলিবে না। রোগীর জন্য সর্বদাই পৃথক্ পাত্র নির্দিষ্ট করিয়া রাখিবে। এই পাত্র রোগী ভিন্ন অন্য কেহ ব্যবহার করিবে না এই পাত্রে কার্বলিক লোশন রাখিয়া রোগী উহাতে থুথু প্রভৃতি ফেলিবে। কার্বলিক লোশন থাকিলে উহাতে মাছি বসিবে না এবং থুথু শুকাইয়া ধূলিকণার আকারে বায়ুর সহিত মিশিতে পারিবে না।

সুস্থ ব্যক্তির থুথু, কাসি প্রভৃতিতে কার্বলিক লোশন মিশাইয়া বাড়ী হইতে দূরে ফেলিয়া দিলেই চলে। কিন্তু যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগগ্রস্ত ব্যক্তির থুথু বা কাসি কার্বলিক লোশনের সহিত মিশাইয়া ফেলিয়া দিলেও রোগের সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে; সুতরাং কার্বলিক লোশনে মিশ্রিত কাসি, থুথু প্রভৃতি কাগজ বা কাঠের গুঁড়ার সঙ্গে মিশাইয়া পোড়াইয়া ফেলা উচিত।

অনুশীলনী

১। যেখানে সেখানে থুথু ফেলার অপকারিতা কি ?
২। কাসি ও থুথুর সহিত কোন্ কোন্ রোগের জীবাণু নির্গত হয় ?
৩। বহু লোকের মিলনস্থানে থুথু ফেলার দোষ কি ?

———

চতুর্থ অধ্যায়

ম্যালেরিয়া

বাংলাদেশে ম্যালেরিয়া-রোগের কথা জানে না এমন লোক অতি বিরল। আমাদের দেশে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র লোক ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে। ইহার ফলে কত গ্রাম ও নগর যে ধ্বংস হইয়া যাইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

উৎপত্তির কারণ—ম্যালেরিয়া শব্দের মূল অর্থ 'দূষিত বায়ু'। পচা ডোবা, নালা জলাভূমি প্রভৃতির নিকটবর্তী স্থানে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব বেশি হয় বলিয়া পূর্বে চিকিৎসকদের ধারণা ছিল যে, এই সমস্ত স্থানের দূষিত বায়ু হইতেই ম্যালেরিয়া উৎপন্ন হয়। কিন্তু ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী ডাক্তার ল্যাভেরান প্রমাণ করেন যে, রক্তে এক প্রকার জীবাণু প্রবেশই ম্যালেরিয়া-জ্বরের কারণ। ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার ডাক্তার স্যার রোণাল্ড রস এনোফেলিস-জাতীয় মশকীর উদরে ম্যালেরিয়ার জীবাণুর সন্ধান পান এবং প্রমাণ করেন যে, এনোফেলিস-মশকীর দংশনের ফলেই সুস্থ ব্যক্তির দেহে এই জীবাণু সংক্রমিত হইয়া থাকে।

ম্যালেরিয়ার জীবাণু—ডাক্তারগণ পরীক্ষা দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, এক প্রকার জীবাণুই ম্যালেরিয়া-জ্বরের কারণ। অন্যান্য রোগের জীবাণুর সহিত ম্যালেরিয়ার জীবাণুর পার্থক্য এই যে, কলেরা প্রভৃতি রোগের জীবাণু জল, বায়ু, মৃত্তিকা

প্রভৃতি আশ্রয় করিয়াও বাঁচিতে পারে, কিন্তু ম্যালেরিয়ার জীবাণু অন্য জীবের শরীর আশ্রয় না করিয়া বাঁচিতে পারে না। যে সমস্ত জীবানু অন্য প্রাণীর দেহ আশ্রয় করিয়া বাঁচিয়া থাকে, তাহাদিগকে **পরজীবী** বলে। সুতরাং দেখা যায় যে, কলেরা, বসন্ত, যক্ষ্মা প্রভৃতি রোগের জীবাণু যেমন জল, বায়ু, খাদ্য প্রভৃতির সাহায্যে মানুষের শরীরে প্রবেশ করে, ম্যালেরিয়ার পরজীবী সেইরূপভাবে প্রবেশ করিতে পারে না। ইহারা ম্যালেরিয়া-রোগীর দেহ হইতে এনোফেলিস-জাতীয় মশকীর শরীরে প্রবেশ করে এবং সেখান হইতে সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করিয়া ম্যালেরিয়া-জ্বর উৎপাদন করে।



পরজীবী

সংক্রমণের উপায়—পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, এনোফেলিস-জাতীয় মশকী দ্বারা ম্যালেরিয়ার জীবাণু রুগ্ন ব্যক্তির দেহ হইতে সুস্থ ব্যক্তির দেহে সংক্রমিত হয়। এই মশা যখন ম্যালেরিয়া-রোগীর রক্ত পান করে, তখন রক্তের সহিত ম্যালেরিয়ার জীবাণু ইহার উদরে প্রবেশ করে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি পুরুষ এবং কতকগুলি স্ত্রী-জাতীয় জাবাণু থাকে। এই জীবাণুগুলি মশকীর পাকস্থলীর গাত্রে শাবক প্রসব করে। এই নূতন জীবাণুগুলি পাকস্থলীর গাত্র হইতে ক্রমশঃ মশকীর লালাগ্রন্থিতে আশ্রয় লয়। মশকীর শরীরে এই পরিবর্তন ঘটিতে ১২ হইতে ২১ দিন লাগে।

মশকী যখন সুস্থ ব্যক্তির শরীরে শুঁড় প্রবেশ করাইয়া রক্ত পান করে, তখন কয়েক বিন্দু লালা চর্মের ভিতর দিয়া প্রবেশ

করাইয়া দেয়। এই লালার সঙ্গে ম্যালেরিয়ার জীবাণু সুস্থ ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করে। মানবশরীরে প্রবেশ করিবামাত্র এই জীবাণুগুলি রক্তের রক্তকণিকার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তাহাই আহার করিয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। পূর্ণতা-প্রাপ্ত হইলে প্রত্যেক জীবাণু বিভক্ত হইয়া বহু সংখ্যক নূতন জীবাণুতে পরিণত হয়। এই নূতন জীবাণুগুলি বর্দ্ধিত হইয়া আবার অসংখ্য নূতন নূতন জীবাণুতে বিভক্ত হয় এবং রক্তের রক্তকণিকার আবরণ ভেদ করিয়া বাহিরে আসে। জীবাণুগুলি সাধারণতঃ মানবশরীরে ১০।১২ দিন বর্দ্ধিত ও বিভক্ত হইবার পরে ম্যালেরিয়া জ্বর দেখা দেয়। ইহারা যখন সংখ্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া রক্তের রক্তকণিকার আবরণ ভেদ করিয়া বাহিরে আসে, ঠিক তখনই কম্প দিয়া জ্বর আসে।

ম্যালেরিয়ার জীবাণুগুলি বিভক্ত হইবার সময় উহা হইতে এক প্রকার বিষাক্ত রস নির্গত হয়। এই রসই উত্তাপবৃদ্ধির কারণ। ঘর্মের সহিত এই রস শরীর হইতে নির্গত হইলে জ্বরের বিরাম হয়।

ম্যালেরিয়ার শ্রেণীভেদ—ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্রধানতঃ তিন প্রকার। এক জাতীয় জীবাণু ২৪ ঘণ্টা অন্তর বিভক্ত হয়। ইহারা মানবদেহে প্রবেশ করিলে প্রত্যহ নির্দিষ্ট সময়ে জ্বর আসে।

আর এক প্রকার জীবাণু ৪৮ ঘণ্টা অর্থাৎ ২ দিন অন্তর বিভক্ত হয়। ইহারা মানবদেহে প্রবেশ করিলে এক দিন অন্তর জ্বর আসে। আর এক প্রকার জীবাণু ৭২ ঘণ্টা অর্থাৎ ৩ দিন

অন্তর বিভক্ত হয়। ইহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে ২ দিন অন্তর পালা করিয়া জ্বর আসে।

কোন কোন ম্যালেরিয়া-রোগীর জ্বর আসিবার সময় নির্দিষ্ট থাকে না বা জ্বরের মোটেই বিরাম হয় না। এরূপ অবস্থায় বুঝিতে হইবে যে, একাধিক জাতীয় জীবাণু শরীরে প্রবেশ করিয়াছে।



মশারির ভিতরে ও বাহিরে শয়ন

সংক্রমণ নিবারণের উপায়—তোমরা পূর্বেই পড়িয়াছ এনোফেলিস জাতীয় স্ত্রী-মশক ম্যালেরিয়া বিস্তার করে। সুতরাং যাহাতে এই জাতীয় মশা কামড়াইতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিলে ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ নিবারণ করা যাইতে পারে। এই জাতীয় মশা দিনের বেলায় প্রায় বাহির হয় না। ইহারা

দিনের বেলায় বনেজঙ্গলে ও অন্ধকারময় স্থানে লুকাইয়া থাকে এবং সন্ধ্যা হইলেই আহারের খোঁজে বাহির হয়। সুতরাং সন্ধ্যার পর জামা-কাপড় দিয়া শরীর ঢাকিয়া রাখিলে এবং রাত্রিতে মশারির ভিতরে শয়ন করিলে ইহারা কামড়াইতে পারে না। এজন্য সকলেরই মশারি ব্যবহার করা উচিত।

ম্যালেরিয়া নিবারণের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় মশার বিনাশসাধন। পচা ডোবা, গর্ত প্রভৃতি যে সমস্ত স্থানে জল জমিয়া থাকে, সেখানেই মশা ডিম পাড়ে। এনোফেলিস-মশা দিনের বেলায় বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বস্থ বনেজঙ্গলে লুকাইয়া থাকে। সুতরাং গ্রামের সমস্ত খানা, ডোবা প্রভৃতি ভরাট করিয়া ফেলিলে এবং জঙ্গল কাটিয়া পরিষ্কার করিলে মশার বংশ ধ্বংস হইবে। এ সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।

তোমরা দেখিয়াছ, ম্যালেরিয়া-রোগীর শরীর হইতেই ম্যালেরিয়ার জীবাণু মশকীর শরীরে প্রবেশ করে। সুতরাং ম্যালেরিয়া-রোগী হইতে যাহাতে রোগের জীবাণু সংক্রমিত হইতে না পারে তজ্জন্য ঔষধের সাহায্যে মানবশরীরস্থ ম্যালেরিয়া-জীবাণু নষ্ট করা আবশ্যক। **কুইনাইন ম্যালেরিয়ার একটি শ্রেষ্ঠ ঔষধ।** নিয়মিতরূপে কুইনাইন সেবন করিলে উহা রক্তের সহিত মিশিয়া ম্যালেরিয়ার জীবাণু অনেক পরিমাণে নষ্ট করিয়া ফেলে। সুতরাং গ্রামে ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইলে সুস্থ ব্যক্তিদেরও প্রত্যহ কিছু কিছু কুইনাইন সেবন করা উচিত।

কুইনাইন সেবনে সকল প্রকার জীবাণু নষ্ট হয় না। এজন্য ম্যালেরিয়া-রোগী আরোগ্যলাভ করিলেও তাহার দ্বারা মশার

সাহায্যে রোগের জীবাণু অন্য লোকের শরীরে সংক্রমিত হইবার আশঙ্কা থাকে। অল্পদিন হইল 'প্ল্যাজ্‌মোচিন' নামক একটি ঔষধ বাহির হইয়াছে। ইহা কুইনাইনের সহিত সামান্য পরিমাণে ব্যবহার করিলে ম্যালেরিয়ার সমস্ত জীবাণু নষ্ট হইয়া যায়।

অনুশীলনী

১। ম্যালেরিয়ার জীবাণু সম্বন্ধে যাহা জান বল। ম্যালেরিয়ার জীবাণুর সহিত কলেরা প্রভৃতি রোগের জীবাণুর পার্থক্য কি?

২। ম্যালেরিয়া জ্বর কি উপায়ে অসুস্থ ব্যক্তির দেহ হইতে সুস্থ ব্যক্তির দেহে সংক্রমিত হয়?

৩। ম্যালেরিয়ায় সংক্রমণ নিবারণ করিতে হইলে কি কি উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক?

৪। ম্যালেরিয়া রোগে কখন কখন পালা করিয়া জ্বর আসে—ইহার কারণ কি?

পঞ্চম অধ্যায়

মশার কথা

১। মশার জন্ম-বিবরণ

মশা সাধারণতঃ দুই প্রকার—**এনোফেলিস** (Anopheles) ও **কিউলেক্স** (Culex)। যে জাতীয় মশা ম্যালেরিয়ার জীবাণু সংক্রমিত করে, তাহার নাম এনোফেলিস এবং অন্যান্য মশার সাধারণ নাম কিউলেক্স। ডিম্ব হইতে পূর্ণতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত মশার জীবনে চারিটী অবস্থা দেখা যায়। যথা :—

(১) **প্রথম অবস্থায়—ডিম্ব** (Egg)

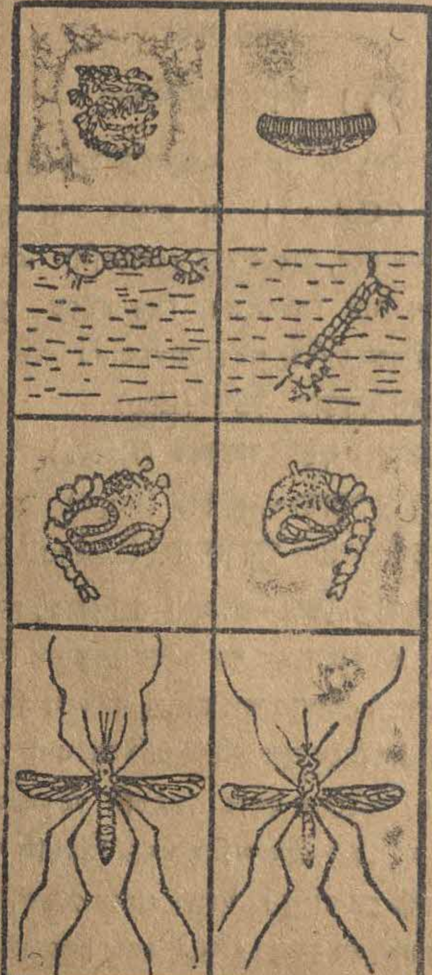
(২) **দ্বিতীয় অবস্থা—শূককীট** (Larva)

(৩) **তৃতীয় অবস্থা—মূককীট** (Pupa)

(৪) **চতুর্থ অবস্থা—পূর্ণাঙ্গ মশা** (Mosquito)

প্রথম অবস্থা : ডিম্ব—স্ত্রী-মশা পচা ডোবা, গর্ত প্রভৃতির জলের ধারে এককালে এক শত হইতে দেড় শত ডিম পাড়ে। বাড়ীর আশেপাশে কোথাও জল জমিয়া থাকিলে কিংবা ভাঙ্গা হাঁড়ি, কলসী প্রভৃতিতে জল জমিয়া থাকিলে মশা সেই জলেও ডিম পাড়ে। কিউলেক্স-মশার ডিমগুলি একসঙ্গে জড়াইয়া ভাসিতে থাকে ; কিন্তু এনোফেলিস-মশার ডিমগুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে জলে ভাসিতে থাকে। ইহারা প্রথমে শ্বেতবর্ণ থাকে এবং পরে ক্রমে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। এই সমস্ত ডিম এত ছোট যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ব্যতীত খালি চোখে ইহাদিগকে দেখা যায় না।

দ্বিতীয় অবস্থা ঃ শূককীট—এই সকল ডিম হইতে তিন দিনের মধ্যে একপ্রকার ছোট ছোট কীট বাহির হয়, ইহাদিগকে



প্রথম অবস্থা ডিম — প্রথম অবস্থা ডিম

দ্বিতীয় অবস্থা শূককীট — দ্বিতীয় অবস্থা শূককীট

তৃতীয় অবস্থা মূককীট — তৃতীয় অবস্থা মূককীট

চতুর্থ অবস্থা পূর্ণাঙ্গ মশা — চতুর্থ অবস্থা পূর্ণাঙ্গ মশা

এনোফেলিস-মশা   কিউলেক্স-মশা

শূককীট বলে। ইহাই দ্বিতীয় অবস্থা। এই অবস্থায় ইহাদিগকে খালি চোখে দেখা যায়। তোমরা পচা ডোবা প্রভৃতির জলে যে অসংখ্য ছোট ছোট পোকা দেখিতে পাও, ইহারা মশার বাচ্চা ভিন্ন আর কিছুই নহে। শূককীটের মাথা, বুক ও লম্বা উদর আছে কিন্তু পা নাই। মাথায় মুখ ও বড় বড় দুইটি চোখ আছে।

এই অবস্থায় ইহারা জলের ভিতর থাকে। ইহাদের ক্ষুধা খুব বেশী ; ইহারা জলের ছোট ছোট পোকা ও গলিত লতাপাতা খাইয়া জীবনধারণ করে। শ্বাস লইবার জন্য ইহারা মধ্যে মধ্যে জলের উপরিভাগে উঠিয়া থাকে। এই অবস্থায় ইহারা ২।৩ বার খোলস ছাড়ে এবং ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

তৃতীয় অবস্থা : মূককীট—জন্মের ৮।১০ দিন পরে মূককীটের দেহ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। তখন ইহার সম্মুখের দিক্‌টা মোটা হইয়া গুটাইয়া যায় এবং শরীর একটা পাতলা আবরণের মধ্যে প্রবেশ করে। এই অবস্থায় ইহাকে **মূককীট** বলে। মূককীটের আকৃতি অনেকটা কমা (,) চিহ্নের ন্যায়। ইহার মুখ নাই, কারণ তখন ইহার আহার করিবার প্রয়োজন হয় না। মাথার দিকে যে দুইটি শুঁড়ের মত লম্বা নল আছে, তাহা দ্বারা ইহারা শ্বাস গ্রহণ করে। এই অবস্থায় ইহারা জলে সাঁতার দিয়া বেড়ায়। তাড়া পাইলেই ইহারা জলের তলায় ডুবিয়া যায় এবং খানিক পরেই আবার ভাসিয়া উঠে। এই অবস্থায় ইহারা ২।৩ দিন থাকে।

চতুর্থ অবস্থা : পূর্ণাঙ্গ মশা—মূককীটের জন্মের ২।৩ দিনের মধ্যে ইহার ভিতর হইতে মশা বাহির হয়। মশা বাহির

হইবার সময় হইলে মূককীটের ছুটাছুটি বন্ধ হইয়া যায়। তখন ইহার আকৃতি আর কমার ন্যায় বক্র থাকে না, সোজা হয়। তখন ইহা স্থির হইয়া জলের উপর ভাসিতে থাকে এবং পূর্ণদেহ মশা ইহার মস্তকের খোলস বিদীর্ণ করিয়া বাহির হয়। মশা বাহির হইয়া ২।১ ঘণ্টা কাল মূককীটের খোলসের উপর বসিয়া থাকে। পরে পা শক্ত হইলে এবং ডানা শুকাইলে ইহা খাদ্যের অন্বেষণে উড়িয়া চলিয়া যায়।

পরীক্ষা—তোমরা মশার জন্মের বিভিন্ন অবস্থা সহজেই পরীক্ষা করিতে পার। কোন পচা ডোবা বা গর্ত হইতে খানিকটা জল লইয়া একটা বোতলে রাখিয়া দাও। উহাতে মশার ডিম থাকার খুবই সম্ভাবনা। ২।৩ দিন পরে দেখিবে, ডিম ফাটিয়া এক প্রকার পোকা বাহির হইয়াছে এবং উহারা বোতলের জলে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। শূককীটের জন্মের ৮।১০ দিন পরে দেখিতে পাইবে, ইহারা খোলস বদলাইয়া কমার আকার ধারণ করিয়াছে—ইহারাই মূককীট। ২।৩ দিন পরে আবার দেখিতে পাইবে, মূককীটগুলি খোলস বদলাইয়া পূর্ণাঙ্গ মশায় পরিণত হইয়াছে।



মশার শরীরের বিভিন্ন অংশ—মশার শরীর মস্তক, বক্ষ ও উদর, এই তিনটি অংশে বিভক্ত। মস্তকের উপরে দুইটি বড় বড় চক্ষু আছে। মাথার ঠিক সম্মুখে একটি হুল আছে; ইহার দ্বারা মশা রক্ত শোষণ করিয়া খায়। ইহার দুই দিকে

দুইটি শুঁড় আছে ; ইহারাই মশার স্পর্শেন্দ্রিয়। মাথার উপরে গোঁফের মত আর দুইটি লম্বা জিনিস আছে। বক্ষঃস্থলের নীচ হইতে তিন জোড়া পা ও এক জোড়া পাখা বাহির হইয়াছে। নিম্নের চিত্রে একটি পূর্ণাঙ্গ মশা অনেক বড় করিয়া দেখান হইল।



এনোফেলিস-মশা



কিউলেক্স-মশা

মশার জীবনধারণ ও প্রকৃতি—মশার জীবনের প্রথম তিনটি অবস্থা জলে অতিবাহিত হয়। পূর্ণাঙ্গ মশা স্থলে বাস করে। ইহারা সাধারণতঃ দিনের বেলায় ছায়াযুক্ত অন্ধকারময় স্থানে থাকিতে ভালবাসে। সন্ধ্যা হইলেই আহারের অন্বেষণে বাহির হয়। কোন কোন মশা দিনের বেলাও মানুষ বা অন্য প্রাণীকে কামড়ায়।

পুরুষ-মশা ৩।৪ সপ্তাহের বেশী বাঁচে না। ইহারা মানুষ বা অন্য কোন জীবজন্তুর রক্ত পান করে না ; ইহারা ফল, ঘাস, লতাপাতা প্রভৃতির রস পান করিয়া জীবনধারণ করে। স্ত্রী-মশা

মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর রক্ত পান করে। ইহারা ৪।৫ মাস পর্যন্ত জীবিত থাকে। ইহাদের ডিম্বের পুষ্টির জন্য রক্ত পান করা একান্ত আবশ্যক। ইহারা মানুষ বা পশুর শরীরে বসিয়া হুলটি চর্মের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়া রক্ত শোষণ করে। রক্ত শোষণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে ইহারা খানিকটা লালারস চর্মের ভিতরে প্রবেশ করাইয়া দেয়। এইজন্যই মশার কামড়ে জ্বালা হয়। এই লালারস রক্তকে তরল অবস্থায় রাখে বলিয়া রক্তপানে সুবিধা হয়।

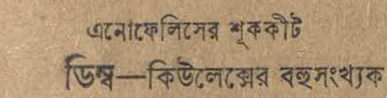
এক মিনিট কাল রক্ত পান করিলেই মশকীর উদর পূর্ণ হইয়া যায়। একবার রক্তপান করায় উদর পূর্ণ না হইলে একই মশকী একই রাত্রে একাধিক ব্যক্তিকে দংশন করে। ইহাতে একই মশা দ্বারা এক রাত্রির মধ্যে একাধিক ব্যক্তির শরীরে ম্যালেরিয়ার বিষ সংক্রমিত হইতে পারে। অবশ্য দংশনের সময়ে মশকীর দেহে ম্যালেরিয়ার জীবাণু না থাকিলে কাহারও কিছু হয় না। রক্তপানের পর মশকী ঐ রক্ত পরিপাক করিবার জন্য ঘরের অন্ধকারময় কোণে গিয়া লুকাইয়া থাকে এবং ডিম পাড়িবার সময় হইলে নিকটবর্তী জলাশয়ে চলিয়া যায়। ডিম পাড়িবার পর মশকী বনেজঙ্গলে বা অন্য কোন অন্ধকারময় স্থানে লুকাইয়া থাকে এবং সূর্যাস্তের পর পুনরায় রক্তপান করিবার জন্য বাহির হয়।

একটি স্ত্রী-মশা হইতে শত শত মশার জন্ম হয়। মশকী যে জলাশয়ে জন্মগ্রহণ করে, সাধারণতঃ সেই জলাশয়েই ডিম পাড়ে। ইহারা প্রায়ই জন্মস্থান হইতে আধ মাইলের বেশী দূরে যায় না।

২। এনোফেলিস-মশা চিনিবার উপায়

এনোফেলিস-জাতীয় স্ত্রী-মশা দ্বারাই ম্যালেরিয়ার জীবাণু অসুস্থ ব্যক্তির দেহ হইতে সুস্থ ব্যক্তির দেহে সংক্রমিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই জাতীয় মশা কি ভাবে চিনিতে পারা যায়, তাহা সকলেরই জানিয়া রাখা আবশ্যক। বাড়ী-ঘরে সচরাচর যে সব মশা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কিউলেক্স জাতীয়। নিম্নে কিউলেক্স ও এনোফেলিস-মশার বিভিন্ন বিষয়ে পার্থক্যের কথা আলোচনা করা হইল—

(ক) জন্মগত পার্থক্য :—



এনোফেলিসের শূককীট



কিউলেক্সের শূককীট

ডিম্ব—কিউলেক্সের বহুসংখ্যক ডিম্ব একত্র সংলগ্ন হইয়া ভেলার ন্যায় জলে ভাসে; কিন্তু এনোফেলিসের ডিমগুলি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে জলে ভাসিতে থাকে।

শূককীট—কিউলেক্সের শূককীট মাথা নীচের দিকে রাখিয়া জলের মধ্যে ঝুলিয়া থাকে; কিন্তু এনোফেলিসের শূককীট সমান্তরাল ভাবে জলে ভাসে।

মূককীট—এ অবস্থায় ইহাদের বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না।



এনোফেলিসের মূককীট



কিউলেক্সের মূককীট

(খ) আকৃতিগত পার্থক্য :—

(১) **আকার**—এনোফেলিস কিউলেক্স অপেক্ষা আকারে কিঞ্চিৎ ছোট।

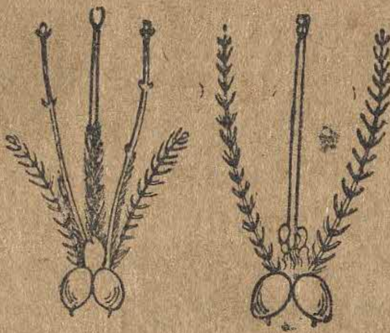
(২) **পাখা**—এনোফেলিসের পাখায় কাল কাল দাগ আছে; কিন্তু কিউলেক্সের পাখায় কোন দাগ নাই।

(৩) **শুঁড়**—কিউলেক্স-পুরুষের হুলের সংলগ্ন শুঁড় দুইটি লম্বা; কিউলেক্স-স্ত্রীর শুড় নাই। এনোফেলিসের স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই শুঁড় হুলের মত লম্বা।

(৪) **গোঁফ**—কিউলেক্স পুরুষ-মশার গোঁফ বেশী, স্ত্রী-মশার গোঁফ কম; এনোফেলিস-পুরুষের গোঁফ কিউলেক্স-পুরুষ অপেক্ষা কম। এনোফেলিস স্ত্রী-মশার গোঁফ আরও কম।

(৫) **বসিবার ভঙ্গী**—কিউলেক্সের দেহ কুঁজো কিন্তু এনোফেলিসের দেহ সোজা। দেওয়ালে বসিবার সময় কিউলেক্স দেওয়ালের সহিত সমান্তরাল হইয়া বসে, কিন্তু এনোফেলিস

মাথাটি প্রায় দেওয়ালে ঠেকাকইয়া পিছন দিক্‌টা উঁচু করিয়া বসে।



এনোফেলিসের মাথা কিউক্সের মাথা

(গ) প্রকৃতিগত পার্থক্য ঃ—

এনোফেলিস দিনের বেলায় বাহির হয় না এবং উড়িবার সময় কোন শব্দ করে না, কিন্তু কিউলেক্স দিনরাত্রি সকল সময়েই বাহির হয় এবং উড়িবার সময় ভন্ ভন্ শব্দ করে।



এনোফেলিসের বসিবার ভঙ্গী কিউলেক্সের বসিবার ভঙ্গী

৩। মশার জন্ম-নিবারণ

তোমরা দেখিয়াছ, মশার দ্বারাই ম্যালেরিয়ার জীবাণু সংক্রমিত হয়। সুতরাং মশকবংশ ধ্বংস করিতে পারিলেই দেশ হইতে ম্যালেরিয়ার রোগকে দূরীভূত করা যায়। মশা জন্মিলে তাহাদের বিনাশসাধন করা সহজ নহে ; কিন্তু মশা যাহাতে জন্মিতে না পারে তাহার ব্যবস্থা করা অপেক্ষাকৃত সহজ। মশার জন্ম নিবারণের ব্যবস্থা দ্বারাই ইটালী দেশ হইতে ম্যালেরিয়া দূরীভূত হইয়াছে। নিম্নলিখিত তিন প্রকার উপায়ে মশার বংশ ধ্বংস করা যায় :—

(১) মশার ডিম্বপ্রসব-নিবারণ।

(২) মশার শূককীটের বিনাশসাধন।

(৩) মশার বাসস্থানের ধ্বংসসাধন।

মশার ডিম্বপ্রসব-নিবারণ—মশা বদ্ধ জলেই ডিম পাড়ে। এ জন্য যেখানেই জল জমিয়া পচিতে আরম্ভ করে, সেখানেই অসংখ্য মশার জন্ম হয়।

বর্ষাকালে মশার উপদ্রব বেশি হয়। তাহার কারণ এই যে তখন যেখানে সেখানে জল জমিতে থাকে বলিয়া মশার ডিম্বপ্রসবের খুব সুবিধা হয়। বাড়ীর আশেপাশে কোথাও ভাঙ্গাহাঁড়ি, কলসী, বোতল প্রভৃতি ফেলিলে উহাতে বৃষ্টির জল জমে। এই জলেও মশা ডিম পাড়ে। সুতরাং গ্রামের ভিতরে বা বাহিরে অন্ততঃ আধ মাইলের মধ্যে যে সমস্ত খানা, ডোবা, গর্ত বা পচা পুকুর আছে, তাহা ভরাট করিয়া ফেলিলে এবং বাড়ীর নিকটে কোথাও ভাঙ্গা হাঁড়ি, কলসী প্রভৃতি না ফেলিলে মশা ডিম পাড়িতে পারিবে না। রেলের রাস্তায় উপযুক্ত সংখ্যক জল নির্গমনের পথ না রাখায়

আমাদের দেশের কোন কোন অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার খুব বেশী প্রাদুর্ভাব হইতে দেখা যায়। এজন্য রেলপথ নির্মাণকালে উপযুক্ত সংখ্যক জল নির্গমনের পথ রাখা উচিত এবং রেলপথের উভয় পার্শ্বে যে সমস্ত গর্ত খনন করিয়া মাটি তোলা হয়, তাহা ভরাট করিয়া পার্শ্ববর্তী জমির সহিত সমতল করিয়া দেওয়া উচিত।

মশার শূককীটের বিনাশসাধন—যে জলাশয় ভরাট করা সম্ভবপর নয়, সেখানেশূককীটের বিনাশসাধন করিয়া মশার জন্ম নিবারণ করা যায়। একটি বোতলের জলে শূককীট রাখিয়া উহাতে কয়েক ফোঁটা কেরোসিন তৈল ঢালিলে দেখিতে পাইবে শূককীটগুলি মরিয়া যাইবে। শূককীটগুলি জলের উপর হইতে শ্বাসবায়ু গ্রহণ করে। জলের উপর তৈলের যে পাতলা আবরণ পড়ে, ইহারা সেই আবরণ ভেদ করিয়া জলের উপর হইতে শ্বাস গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিয়া যায় এজন্য পচা ডোবা, পুকুর, গর্ত প্রভৃতি যে সমস্ত জলাশয়ে মশা জন্মে সেই সমস্ত জলাশয়ে যদি সপ্তাহে একবার কিছু কেরোসিন তৈল পিচকারী দিয়া ছিটাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে মশার শূককীটগুলি শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিয়া যাইবে। ৪ হাত দীর্ঘ এবং ৪ হাত প্রশস্ত স্থানের জন্য মাত্র এক ছটাক কেরোসিন তৈলের আবশ্যক হয়। বিস্তীর্ণ জলাভূমিতে প্যারিস গ্রীণ (Paris green) নামক দ্রব্য ছড়াইয়া শূককীট বিনাশ করা যায়।

যে সমস্ত জলাশয়ের জল লোকে ব্যবহার করে তাহাতে কেরোসিন দেওয়া যায় না। ঐগুলিতে কই, খলসে, পুঁটি প্রভৃতি ছোট ছোট মাছ ছাড়িলে ইহারা শূককীট খাইয়া ফেলিবে।

জলের ধারে ঘাস প্রভৃতি থাকিলে মাছের তাড়া খাইয়া শূককীটগুলি উহাতে আশ্রয় লয়। সুতরাং পুকুর প্রভৃতি জলাশয়ের কিনারায় ঘাস বা আগাছা জন্মিতে দেওয়া উচিত নয়।

মশার বাসস্থানের ধ্বংসসাধন—মশা সাধারণতঃ দিনের বেলায় ঘরের অন্ধকার কোণে, আসবাবপত্রের আড়ালে গোয়াল ঘরে এবং বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বস্থ বন, জঙ্গল, ঝোপ, কচুরিপানায় ভরা ডোবা, পুকুর প্রভৃতিতে লুকাইয়া থাকে এবং সন্ধ্যা হইলে আহারের অন্বেষণে বাহির হয়। সুতরাং শয়নগৃহে বেশী আসবাব পত্র না রাখিলে, বাড়ীর চতুপার্শস্থ বনজঙ্গল কাটিয়া ফেলিলে এবং বাড়ীর নিকটবর্তী জলাশয়সমূহ হইতে কচুরিপানা উঠাইয়া ফেলিলে, লুকাইয়া থাকিবার স্থানের অভাবে মশা দূরে চলিয়া যাইবে। মশা সাধারণতঃ আহারের অন্বেষণে বা ডিম পাড়িবার জন্য আধ মাইলের বেশী দূরে যায় না। এজন্য গ্রামের ভিতরে এবং গ্রামের বাহিরে অন্ততঃ আধ মাইলের মধ্যে বনজঙ্গল রাখা উচিত নয়।

অনুশীলনী

১। মশা কয় প্রকার? কোন্ মশা ম্যালেরিয়ার জীবাণু বহন করে?
২। মশার জীবনের চারটি বিভিন্ন অবস্থা বর্ণনা কর।
৩। মশার প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা জান বল।
৪। পূর্ণাঙ্গ কিউলেক্স ও এনোফেলিস-মশার মধ্যে পার্থক্য কি?
৪। এনোফেলিস-মশা চিনিতে পারার উপায় কি?
৬। দেহ হইতে ম্যালেরিয়া দূর করিবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় কি?
৭। মশার জন্ম নিবারণ করার উপায়গুলি কি কি?
৮। 'আমাদের দেশের রেলপথগুলি ম্যালেরিয়া বিস্তারের জন্য অনেক পরিমাণে দায়ী'—এ কথার অর্থ কি?